পরিচায়িকা

'একেই কি বলে সভ্যতা' মধুসূদনের লেখা একটি নামকরা প্রহসন। ঐতিহাসিক কারণে এবং শিল্পগতগুণে লেখাটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে। রচনাটি নিয়ে আগে নানা সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, আরও আলোচনা হবার সুযোগ রয়েছে। অধ্যাপক ড. সুবীর মুখোপাধ্যায় প্রহসনটির একটি সটীক সংস্করণ তৈরি করেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনাসমৃদ্ধ ভূমিকা লিখেছেন। একটি প্রয়োজনীয় কাজ করা হল। উঁচুস্তরের ছাত্র এবং শিক্ষকেরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

মধুসূদন এই প্রহসনটি লিখেছিলেন বেলগাছিয়ার থিয়েটারের জন্য। এটির সঙ্গে আরও একটি নাটিকা ছিল 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। দুটি মিলে মধুসূদন সমকালীন সমাজের একটি পুরো ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন। লেখা হিসেবে প্রতিটি স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু নাট্যকারের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মোট পরিচয় পেতে গেলে দুটি মিলিয়ে দেখতে হয়। নাট্যকার গ্রামীণ ধর্মধ্বজী রক্ষণশীলদের এবং শহুরে বেসামাল নব্যপন্থীদের সমান তিরস্কার করেছিলেন, একথা মনে রাখলে পৃথকভাবে লেখাগুটিকে বিচার করায় ফাঁক থাকে না।

মধুসূদন প্রধানত অতীতকালের রঙীন পটভূমিতে তাঁর কাব্য-নাটকগুলিকে স্থাপিত করতে পছন্দ করতেন। তারই ভেতরে ভেতরে নব্য মানুষের ভাব ও জিজ্ঞাসা, আবেগ ও হতাশার সবকিছু বা অনেককিছু তিনি ধরে রাখতে চাইতেন। সরাসরি চারপাশের সমাজজীবন এবং মানুষের কথা নিয়ে লেখা হল এই দুই প্রহসন, এবং এ-দুটিই ব্যঙ্গের ফ্রেমে বাঁধানো। সমাজবাস্তবতা তাঁর লেখায় বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হয়েই প্রকাশ পেল। এটা ভাবার মতো।

নতুন শিক্ষিত বাঙালির ভাব-অনুভূতির প্রশ্ন এবং ট্র্যাজেডি লিখবার জন্য অতীতের বিষয়, পুরাণ-ইতিহাসের জগতে তাঁকে যেতে হয়েছে; আর নতুন-কালের জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য ধরতে গেলেই দৃষ্টি ব্যঙ্গে বক্র এবং ভর্ৎসনায় উদ্যত হয়ে উঠেছে। এথেকে মনে হয় শিল্পী হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন নব্য-মানবতার মহিমার দিকটা ভাবগত যতটা, ততখানি মোটেই বস্তুগত নয়।

বাস্তব জীবনের আচরণে প্রধানত ক্লেদ-গ্লানিই জমে আছে। ব্যঙ্গের অস্ত্র ছাড়া তাকে ভেদ করা যাচ্ছে না। এই বোধ প্রমাণ করে, জীবন ও সমাজসংস্থানে যে ধরনের নবজাগরণ এসেছিল, তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মধুসূদনকে দিয়ে প্রহসন লিখিয়ে নেবার পরেও বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ এগুলি মঞ্চস্থ করতে সাহসী হননি, যদিও অনেক খরচ করে রত্নাবলী-শর্মিষ্ঠার মতো নাটক অভিনয়ে তাঁদের উৎসাহ ছিল।

একসময় তো 'একেই কি বলে সভ্যতা' নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ ছিল। শ্লীল-অশ্লীলের ভিক্টোরীয় ধারণা মাথায় রেখে সমাজ ও জীবনের সত্য খোঁজা যায় না, মধুসূদন এ-কথা বুঝেছিলেন। সে-কারণেই মানুষের এত বিচিত্র রূপ —ভাঙাচোরা অসংলগ্ন বিকৃত চেহারা, যেন শোভাযাত্রা করে এই প্রহসনের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। কলকাতার বাইরেকার উজ্জ্বলতা গৌরব-ধনাঢ্যতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তার ভিতরের পাপক্লিষ্ট স্তরগুলি সামনে এনেছে এই প্রহসন।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের ভাষাও বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কলকাতার কথ্যভাষার নানাস্তরের নানাভঙ্গিকে এমনভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে এই রচনায়, বাংলা চলিতভাষার বিবর্তন বুঝতে যা বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ির প্রভাব না পড়লে বাংলা চলিতগদ্য হয়ত অন্যপথে, অন্যরীতিতে বিকশিত হত।

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে যতবেশি ভাবা ও লেখা যায়, ততই ভালো— তাতে নানা অজানা দিকে আলো পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে প্রহসনকাররূপে মধুসূদনের বিশিষ্ট একটি স্থান আছে। কিন্তু আক্ষেপের কথা এই, তাঁর এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বিস্তৃত কোন আলোচনা আজ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। যেটুকু হয়েছে, তা মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা-বিশ্লেষণের সূত্র ধরে আংশিকভাবে—পূর্ণাঙ্গভাবে নয়। অথচ, মধুসূদনের প্রহসনে কত বিচিত্র দিকেরই না ইঙ্গিত রয়েছে—কত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই না তার আলোচনা হতে পারে!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী সাম্মানিক বাংলার পঞ্চম পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানি। অথচ প্রচলিত সমালোচনা গ্রন্থগুলি ছাত্রছাত্রীদের পাঠপ্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়ক নয়। কাজেই এই গ্রন্থের সম্পাদনার সময় তাদের উক্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনটিকে আমি যেমন বিস্মৃত হইনি, তেমনি সাধারণ পাঠকের কাছেও এটিকে আকর্ষক ক'রে তোলবার আয়োজনেও ত্রুটি রাখিনি।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় প্রহসনটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১২৬৬ এবং ১২৬৯ বঙ্গাব্দে। দুটি সংস্করণে পাঠভেদ বিশেষ কিছু ছিল না। দীর্ঘদিন পরে সেই দ্বিতীয় সংস্করণটি অবলম্বনেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের যুগ্মসম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক মধুসূদনের প্রহসনদুটি একত্রিতভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। এখানে উক্ত সংস্করণই আমি অনুসরণ করেছি এবং তার ভূমিকা-অংশে পরিবেশিত নানাবিধ তথ্যও প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করেছি। তবে প্রহসনটির যে বর্ধিত অংশ এখানে সংযোজিত হয়েছে (৮৩-৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তা মূলত গ্রহণ করেছি ড. অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী' (হরফ প্রকাশনী) এবং ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন গ্রন্থাবলী' (সাহিত্য-সংসদ) থেকে। এই প্রসঙ্গে উক্ত সম্পাদক, প্রকাশক সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রহসনটির ভূমিকা-অংশে বিশিষ্ট সমালোচকদের মতামত যেমন উল্লেখ করেছি, তেমনি সে-সব বিশ্লেষণ ক'রে নিজস্ব অভিমত কিছু থাকলে সবিনয়ে তা জানাতেও কুণ্ঠিত হইনি। আলোচ্য বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ক'রে বিশ্লেষণকালে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুনরুক্তি দোষ কিছু এসে গেছে, পাঠক-সাধারণ তা নিজগুণে ক্ষমা ক'রে নিলে বাধিত হব।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের একটি

অর্থসূচী সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণ থেকে তা পরিত্যক্ত হয়। পরিষৎ-সংস্করণে অবশ্য সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে যে 'শব্দার্থ ও টীকা' সংযোজিত হল, তাতে উক্ত অর্থসূচী নানা কারণে হুবহু গ্রহণ করতে পারিনি; কিছু গ্রহণ করেছি, কিছু বা নিজস্ব বিবেচনা-অনুযায়ী পরিবর্তিত ক'রে নিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য প্রহসনটি সম্পর্কে একস্থানে বলেছিলেন "half the fun lies in the absurd jargon interlarded with English words and the cant of debating clubs in which the characters speak." [The Calcutta Review, 1871].

তাই প্রহসনটির সম্যক্ রস উপলব্ধির ক্ষেত্রে অপরিহার্য হবে মনে করেই, শুধু ইংরেজি শব্দ নয়, আলোচ্য অংশে শিষ্ট, অশিষ্ট, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই অজস্র শব্দ এমন কি বাগ্‌ধারাগুলিও সন্নিবিষ্ট করেছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত গ্রন্থখানির 'পরিচায়িকা' অংশ লিখে দিয়ে এটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস, অধ্যাপক বারীন্দ্রকুমার বসু, অধ্যাপক অমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক ড. অলোক রায়, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র প্রমুখের নানাবিধ সহায়তা ও উৎসাহদান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আর একজনের কথা এই মুহূর্তে বিশেষ ক'রে আমার মনে পড়ছে—তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। কাজেই মুদ্রিত আকারে এই গ্রন্থ দেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। এই আক্ষেপ কিছুতেই প্রশমিত হবার নয়।

নানা দিক থেকে গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাসত্ত্বেও এতে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেগুলি আমার নজরে নিয়ে এসে সহযোগিতাসাধন করলে কৃতজ্ঞচিত্তে তা অবশ্যই গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনে প্রয়াসী হব। যে-কোন সমালোচনা কিংবা সুপরামর্শও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে। পরিশেষে বলি গ্রন্থখানি গুণিজনদের সমাদর লাভ করলে এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠপ্রস্তুতিতে কাজে লাগলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিষয়সূচী

যুগ-পরিচয় / ১
মধু-জীবনকথা / ৮
'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্টতা / ১৪
শ্রেণীবিচার / ১৮
কথাবস্তু-অনুসরণ / ২৭
সমাজচিত্র / ৩২
চরিত্রবিচার :
(ক) প্রধান চরিত্র : নবকুমার / ৩৭
(খ) অপ্রধান চরিত্র / ৪২
'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন' :
অসংগতির দ্বন্দ্ব / ৪৯
লঘু বিদ্রূপবর্ষণ / ৫৩
'সৎসাহিত্য'রূপে গ্রহণযোগ্যতা বিচার / ৫৭
অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি / ৬৪
একেই কি বলে সভ্যতা ?
(মূল প্রহসন) / ৬৯
পরিশিষ্ট :
(ক) শব্দার্থ ও টীকা / ৯৮
(খ) প্রহসনটি সম্পর্কে কিছু বিশিষ্ট অভিমত / ১১১
(গ) মধুকবির বংশধারা / ১১৫

যুগ-পরিচয়

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট কলকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হল, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন ঘটল পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি জন্ম নিলেন মধুসূদন দত্ত। পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্রে রাখলে অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাদ্বয়ের সময়সীমা প্রায় একই রকম। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই, ঐ যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে শাসনক্ষমতার শুধু হস্তান্তরই ঘটল না—ঘটে গেল একটা যুগগত পরিবর্তন। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানে এল আধুনিক ধনবাদী যুগ। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমশ বিকাশ ঘটল, কৃষিজীবী মানুষ চাকুরীজীবীতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট একটা চেহারা ফুটে উঠতে লাগল, গ্রাম-জীবনকে শহরজীবন ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকল। মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের পিতাও গ্রামের জমিদারি-বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে, ওকালতিবৃত্তি অবলম্বন ক'রে, কলকাতায় স্থায়িভাবে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। চলিত কথায় এটি 'কোম্পানির আমল', আর ঐতিহাসিকদের মতে 'দ্বৈত শাসনের যুগ'। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এক ঘোষণা-বলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক এদেশের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত না-করা পর্যন্ত 'কোম্পানির আমল'ই চলছিল।

ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার পর, উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভাবসম্পদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। সে শিক্ষাধারার উদারতা, সর্বত্রগামিতা, বিকাশধর্ম, যুক্তিবোধ, এবং নানা বিষয়ে অবাধ সঞ্চরণক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করল। তাই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) প্রথম সচেতনভাবে সেই শিক্ষার ধারাকেই এদেশে আবাহন ক'রে নিয়ে এলেন। তাঁকে নানা ব্যাপারে সহায়তা করলেন ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫—১৮৪২)। এঁদের এবং আরও কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হল। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানে শিক্ষকরূপে যোগ দেন ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১)। ইনি ছাত্রদের মনে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেন, তাদের মনে কাব্যবোধ এবং দেশাত্মবোধেরও সঞ্চার করেন। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান,

সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ডেভিড্ হেয়ার মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি লর্ড মেকলে পরিষ্কারভাবেই জানালেন ইংরেজিভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা এদেশীয়দের দেওয়া হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্পর্কে তিনি আরও উগ্রভাবে বললেন: "Who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia". তাঁদের সিদ্ধান্তের ফল ফলল অল্পকালের মধ্যেই। প্রিন্স দ্বারকানাথের সহায়তায় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হল। পরের বছরই প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'মেকানিক্যাল ইন্স্টিটিউট'—যদিও সেটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। আর ঐ বছরের ১৪ই জুন মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নানা জায়গায় 'বাঙালা পাঠশালা'।

এই সময় ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশে রাজা রামমোহন (১৭৭২—১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬—১৮৮৬)-কে কেন্দ্র ক'রে সংস্কৃতির তিনটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন সমন্বয়বাদী। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ইংলণ্ড-গমনের ফলে প্রথমোক্ত ধারাটি কিছুদিন বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবসরে ডিরোজিও প্রবর্তিত ধারাটি প্রবল হয়ে উঠল। মধুসূদনের মানসগঠনে এই ধারাটির নিবিড় যোগ আছে বলেই সেই ধারার বিশেষ পরিচয়টুকু আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল (অর্থাৎ মৃত্যুর প্রায় আট মাস আগে) তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। এই স্বল্পকালীন শিক্ষকজীবনেই তিনি ছাত্রদের নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিতর্কসভার সূচনা করেন—পরে তা সাতটি পৃথক সভায় পরিণত হয়। এখানে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হত। তাঁর অনুপ্রেরণায় ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এই কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভারতকে ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা, আদালতের বিচারকার্যে ব্যয়বাহুল্য কমান

এবং হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রতি তীব্র আক্রমণ থাকত—এমন কি সে আক্রমণের হাত থেকে খ্রীস্টধর্মও রেহাই পেত না। ফলে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে পত্রিকাটি অল্পকালের মধ্যেই বন্ধ হ'য়ে গেল। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা এর পর 'এন্‌কোয়ারার' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাও কিছুদিন প্রকাশ ক'রে সত্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ডিরোজিওর প্রধান শিষ্য ছিলেন দশজন। এঁরা হলেন: তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪—১৮৫৫), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮—১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১—১৮৯০), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২—১৮৮৭), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩—১৮৭০), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—১৮৯৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫—১৮৬৮)। সেকালে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলতে এঁদেরই বোঝাত।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পর আমাদের দেশে যে-সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে, সেগুলির সঙ্গে এঁদের কারো-না-কারো কোন-না-কোনভাবে সংযোগ ছিল। দেশের অন্যান্য প্রগতিমূলক কাজের সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানের আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেই বিধি প্রণীত হয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর তা বলবৎ হয়েছিল। সেই সভা, কিংবা ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রামমোহনের স্মরণসভা—উভয়ক্ষেত্রেই রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নানাবিধ জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে "Society for the Acquisition of General Knowledge" বা "জ্ঞানার্জনসভা" নামে এক সভা স্থাপিত হল। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় কতকাংশে এর ছায়াপাত ঘটা বিচিত্র নয়। ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার তখনকার সমাজে বেশ দেখা যেত। অবশ্য সামগ্রিকভাবে তাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গ হবার যুগ সেটা নয়। কাজেই তাদের ওপর মহলে ভারতীয় প্রজা-সাধারণের দুর্দশার কথা সঠিকভাবে নিবেদন করতে পারলে প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে—এই বিশ্বাস নিয়েই ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হল এবং ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে 'British Indian Advocate' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল।

ক্রমশ কলকাতাতেও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এ-ব্যাপারে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর কিছু কিছু অবদান রয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল অনুভব করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এব্যাপারে উদ্যোগ আরো আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটিতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একবার প্রশ্ন ওঠে। তখন তার অন্যতর সম্পাদক, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত হলেও, রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষাদানের (Co-education) প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষাদানের বিষয়ে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। তাকে কেন্দ্র ক'রে 'Female Juvenile Society'-র মহিলা সদস্যরা উদ্যোগী হলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এদেশে কুমারী কুক্ উপস্থিত হন। তাঁর উদ্যোগে দেশে দশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং ২৭৭ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করল। এর কয়েক বছরের মধ্যেই "Bengal Ladies' Society" স্থাপিত হল। কিন্তু এঁদের সব চেষ্টাই মূলত ছিল খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য-বিজড়িত অথবা খ্রীস্টান বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ বালিকা-বিদ্যালয়রূপে 'বেথুন স্কুল' স্থাপিত হল। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ক্রমশ এইরকম আরো বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে।

বিধবা-বিবাহের ব্যাপারেও ইয়ং বেঙ্গলীয়দের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটার' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে, তাতে বেশ কয়েক মাস ধরে বিধবাবিবাহ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলে। এমন কি যে পরাশর-বচনকে অবলম্বন ক'রে বিদ্যাসাগর মশাই পরবর্তীকালে এই আন্দোলনে অগ্রসর হন, সেই 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি শ্লোকটিও সেখানে প্রথম উদ্ধৃত হয়েছিল। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার পশ্চাতে থেকে এ-ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। যাই হ'ক, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে এই বিষয়ে জানিয়েছেন: "বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করা যে কর্তব্য এই বিশ্বাস ১৮৭৩ সাল হইতে (তারাচাঁদ) চক্রবর্তী ক্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহারা দশজনে

একত্র হইলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন…ক্রমে এই মত কৃষ্ণনগরেও যায়। …অনুমান করি…বিধবা-বিবাহের সভা ১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে।" এখানে যে সভার কথা উল্লিখিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে 'আত্ম-জীবনচরিত' গ্রন্থে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় জানিয়েছেন যে, একবার কৃষ্ণনগরে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্রের উপস্থিতিকে কেন্দ্র ক'রে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। ভোজনপর্বের শেষে নৌকায় ফেরার পথে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনাকালে "বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে এবিষয়ের জন্য একটি সভা হইল। সভাগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেজের ও স্কুলের ছাত্র।" এর পরে ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব আনেন বিদ্যাসাগর এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই বিষয়ে আইন পাশ হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিধবা-বিবাহ করলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

এ তো গেল 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর গঠনমূলক দিক। তাঁদের ত্রুটিও ছিল যথেষ্ট। এঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতর থেকে। কাজেই মধ্যবিত্ত-মানসিকতাকে সকলক্ষেত্রে অতিক্রম ক'রে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অনেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্নে বিভোর হয়েও পড়েছিলেন। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে এঁরা যে সাহসিকতার পরিচয় রেখে-ছিলেন, তা ছিল সেকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং বহু-ক্ষেত্রেই তা একটা উন্মাদনার নামান্তর হয়েও পড়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে এর কিছু কিছু কৌতুককর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন: "তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাই-গো' বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।" কিংবা "'তখন তাঁহাদের সর্বপ্রধান সৎসাহসের কর্ম ছিল মুসলমানের রুটি ও বাজার হইতে সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন,

'ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়'।" প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরেজিতে লেখা ডেভিড্ হেয়ারের জীবনী-গ্রন্থ থেকেও আমরা জানতে পারি, সেকালে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের পাশ্চাত্য-অনুকরণস্পৃহা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁরা পৈতে নিতে চাইতেন না, সন্ধ্যাহ্নিক করতেন না; পূজার ঘরে তাঁদের জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিলেও তাঁরা হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি ক'রে সময় কাটাতেন। পাশ্চাত্য-অনুকরণের এই মোহ ক্রমশ এত বিস্তৃত হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের দৈনন্দিন কথোপকথনে কিংবা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও ইংরেজি ছাড়া এক পা অগ্রসর হতেন না। বিদেশী ভাষা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত এই বাড়াবাড়ি রাজনারায়ণ বসুকে একসময় এত বিচলিত করেছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা'র সদস্যদের আলাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইংরেজি বাক্য পিছু এক-এক পয়সা জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের আর এক মারাত্মক নেশা ছিল—সুরাপান। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়: "তাঁহারা ইহাকে কুসংস্কার-ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে করিতেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই ভাবেই ইঁহাকে অবলম্বন করেন।" তিনি আরও জানিয়েছেন, পরিণত বয়সে রামমোহন এবং ছাত্রজীবনে রাজনারায়ণ বসুর মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে তাঁরা অত্যন্ত কঠোর ভাবেই এর মাত্রারক্ষায় প্রয়াসী ছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের স্বরূপটিকে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর "Bengal Renaissance and Other Essays" গ্রন্থে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন: "Their only trait which was widely copied in contemporary society was the escape from social conventions, but even here there was no sturdy revolt or bold defiance but mere evasion. This led to sad corruption in which there was amongst the imitators not race of the personal integrity and courage of the real Derozians which have such a charm even today." (p. 25-26)

মধুসূদন হিন্দু কলেজের প্রাথমিক বিভাগে ভর্তি হলেন ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তখন ডিরোজিও আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর ভাবধারা সগৌরবে বহন ক'রে চলেছেন ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন। তাঁর কণ্ঠে শেক্স্পীয়র-আবৃত্তি ছাত্রেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। এ-সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পূর্বোক্ত

গ্রন্থে লিখেছেন : "তাঁহার মুখে সেক্সপীয়ার শুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্দ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপান অবাধে চলিত।" কিন্তু এ গেল কুফলের দিক। মধু-কবির কবিত্ব-স্ফুরণে রিচার্ডসনের প্রভাব অস্বীকার করবার নয়। ডিরোজিও বেঁচে না থাকলেও তাঁর ভাবধারা যেহেতু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেহেতু সেই ভাবধারায় বর্ধিত সকলকেই ব্যাপকভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যা দেওয়া চলে। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই 'ইয়ং বেঙ্গল' যুগের অবসান হল। ডিরোজিও প্রত্যেককে আপন বিচারশক্তি অনুসারে চলবার প্রেরণা দিতেন। কাজেই ইয়ং বেঙ্গলীয়রা সকলে একই ধারায় বিকাশলাভ করেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউ ঝুঁকেছিলেন নাস্তিকতার দিকে, কেউ বা আস্তিকতার দিকে। আবার শেষোক্তদের মধ্যে কেউ বা খ্রীস্টান, কেউ বা ব্রাহ্ম, এমন কি কেউবা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও হয়ে উঠেছিলেন।

এতক্ষণ যে যুগের পরিচয় তুলে ধরা হল, সেই পরিবেশেই মধুসূদনের ছাত্র-জীবন অতিবাহিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি যখন 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখলেন, তখনও সেই পরিবেশ ক্ষীয়মাণ হলেও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি, সেকথা বুঝতে পারি যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণামূলক এক পত্রাংশ থেকে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত এবং তাঁদের অর্থানুকূল্যে পরের বছর মুদ্রিত হয়েও কেন যে মধুসূদনের প্রহসন দুখানি বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে পারল না—তার উল্লেখ রয়েছে উক্ত পত্রে। তাঁর ভাষায়, মহড়া চলাকালে "an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the 'young Bengal' class getting a scent of the farce 'একেই কি বলে সভ্যতা?' and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from produc-

ing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a 'young Bengal') fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yeild at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Raja Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre."

পরিশেষে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য, আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে এদেশে যুগ-পরিবর্তন ঘটেনি ; ঘটেছে বহিরাগত পাশ্চাত্যশিক্ষার সংস্পর্শজনিত কারণে। ফলে পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক যুগ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে টিঁকে থাকতে না পারলেও, তার সঙ্গে আমাদের একটা মোহের বন্ধন থেকে গেল। আবার দুর্বার যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের মধ্যে দিয়ে সুস্থ, সবল এবং স্বাভাবিক আধুনিক ধনবাদী সমাজেরও অভ্যুদয় হল না। ফলে যে সমাজের উদ্ভব হল, তা আধা সামন্ততান্ত্রিক-আধা ধনতান্ত্রিক সমাজ। কাজেই যুগের মধ্যে এবং যুগের মানুষগুলির মধ্যে অল্পবিস্তরভাবে থেকে গেল নানা স্ব-বিরোধিতা তথা অসংগতির বীজ। 'একেই বলে সভ্যতা'য় সেই সব অসংগতি-কেই নানা শিল্পকৌশলে ফুটিয়ে তুলে তাকে হাস্যরসে নিষিক্ত করেছেন প্রহসনকার !

মধু-জীবনকথা

যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক অভিজাত কায়স্থ পরিবারে ১৮২৪ (মতান্তরে ১৮২৩) খ্রীস্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারি মধুসূদনের জন্ম হয়। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। জাহ্নবী দেবী রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী ; মধুসূদন ছিলেন এঁদেরই একমাত্র জীবিত সন্তান। রাজনারায়ণ অবশ্য আরো তিনটি বিয়ে করেছিলেন। আইন-শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিচক্ষণতা তো ছিলই, ফার্সি ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল অসামান্য। ফলে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর দেরি হল না। প্রচুর অর্থ-উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায়

খিদিরপুর অঞ্চলে তিনি একটা সুন্দর দো-তলা বসতবাড়ি কিনেছিলেন। এখানেই মা-বাবার স্নেহনিবিড় সান্নিধ্যে মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবনের অনেক গুলি দিন অতিবাহিত হয়। বাল্য অবশ্য তাঁর কাটে কপোতাক্ষ নদ সন্নিহিত সাগরদাঁড়ি গ্রামে। সেখানকার গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবনের যেমন সূচনা হয়, তেমনি সেই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আগমনী-বিজয়ার গান শুনে তিনি আবেগে পুলকিত হয়ে উঠতেন। আর সন্ধ্যায় মায়ের কাছে বসে শুনতেন রামায়ণ-মহাভারতের অপূর্ব কাহিনী। এসবের মধ্যে দিয়েই তাঁর চোখের সামনে কল্পরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত।

সাত বছর বয়সে তিনি মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় এলেন। এখানে এসে দু'বছর খিদিরপুর স্কুলে পড়বার পর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজেরই প্রাথমিক বিভাগের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এখানেই তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি ভাবীকালের অনেক কৃতী মানুষকেই সহপাঠীরূপে পেয়ে গেলেন। নানা পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ ক'রে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঐ কলেজেরই সিনিয়র বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ক্রমে এই কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন-এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তিনি আসেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটল, অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এখানকার চতুর্থ শিক্ষক স্বাধীনচেতা ও মুক্তমনের মানুষ হেনরি লুই ভিভিয়ান্ ডিরোজিও অবশ্য মধুসূদনের প্রবেশলাভের পূর্বেই কলেজ পরিত্যাগ ক'রে চলে যান, তবুও তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারা তিনি প্রভাবিত না হ'য়ে পারেননি; কারণ তা সেই সামাজিক পরিমণ্ডলে অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাগরদাঁড়ির অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে মধুসূদনের মনে কবিত্বের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, ডিরোজিওর ভাবধারা এবং রিচার্ডসনের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা তাকেই লালিত ক'রে তোলে। ফলে, মধুসূদনের মনে মহাকবি হবার প্রবল আগ্রহ দানা বেঁধে ওঠে। এই সময় বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে তিনি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েন যে, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিল্টনের সমকক্ষতা অর্জনের জন্যে একদিকে তিনি যেমন গভীর অনুশীলনে রত হন, অন্যদিকে তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ', 'Bengal Spectator', 'Calcutta Literary Gazette', 'Comet', 'Literary Gleamer', 'Literary

Blossom' প্রভৃতি পত্রিকায় অবিরত লেখনী-চালনা করতে থাকেন। তিনি স্পষ্টতই তখন মনে করতেন, মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে ইংরেজি ভাষাকে আশ্রয় করলেই তাঁর এই উচ্চাশা সফল হতে পারে। অবশ্য এই দুর্জয়ের সাধনার জন্যে তাঁর ঐসব মহাকবিদের পীঠভূমি ইংলণ্ড-গমনও আবশ্যিক। তাঁর তখন সমস্ত মন-প্রাণ অধিকার ক'রে বসেছিল এক স্বপ্নময় ভূখণ্ড—ইংলণ্ড! ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে একবার পূজার সময় কিছুদিনের জন্যে পিতার সঙ্গে তিনি তমলুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার সমুদ্র-সান্নিধ্যের কথা চিন্তা ক'রে তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন এই কথা ভেবে যে, এরই অপর পারে রয়েছে তাঁর স্বপ্নের দেখা সেই 'ইংলণ্ড'। বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা এক পত্রে তিনি তাই লিখলেন: "I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for 'England's glorious shore'. The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England!" কিন্তু, এ স্বপ্ন তাঁর পূরণ হবে কিভাবে? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ ক'রে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে মিশনারীদের সহায়তায় হয়ত কিছু সুরাহা হতে পারে। মনের দিক দিয়ে এই আধুনিক ধর্মমতের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণও হয়ত গড়ে উঠেছিল। যাই হক, ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ক'রে বসলেন। এখন থেকেই তাঁর নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হল।

প্রথম দিকে এই ঘটনাটি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ জানতেন না। ক্রমে যখন সব প্রকাশ হয়ে পড়ল, তিনি হিন্দু কলেজ ছাড়তে বাধ্য হলেন। অগত্যা ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে শিবপুরের বিশপ্‌স্ কলেজে গিয়ে তিনি ভর্তি হলেন। এখানে গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষার নানা সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। এদিকে মধুর ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে সমাজে এমন আলোড়ন শুরু হল যে, পিতা তাঁকে 'ত্যাজ্য পুত্র' ঘোষণা ক'রে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পড়ার সমস্ত খরচই বন্ধ ক'রে দিলেন! অগত্যা তাঁকে কলেজ ছাড়তে হল। ওদিকে খ্রীস্টান হ'য়ে বিলাত যাবার সুযোগও মিলল না। তাই তাঁকে চাকরির অনুসন্ধান করতে হল। কিন্তু সে-চেষ্টাতেও বিফলমনোরথ হয়ে পাঠ্যপুস্তক বিক্রি ক'রে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে কলেজেরই কিছু মাদ্রাজী খ্রীস্টান-বন্ধুর সহায়তায় নিছক ভাগ্য-পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এবার হল তাঁর মাদ্রাজ

যাত্রা। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের শুরু—মাদ্রাজ-প্রবাসের এই আট বছর কাল তাঁর অত্যন্ত দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে দিয়ে কাটে। এই সময় তিনি শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিচিত্র পেশাকে অবলম্বন করেন। 'Madras Circulator and General Chronicle', 'Athenaeum' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে এইসময় তিনি যুক্ত ছিলেন এবং 'Spectator' পত্রিকার সহ-সম্পাদনাও করতেন। একই সঙ্গে চলেছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনা। 'Timothy Pen-poem' ছদ্মনামে তিনি 'The Captive Ladie' এবং Visions of the Past' এই সময়েই (১৮৪৯) রচনা করেছিলেন। এগুলি লেখার সময় তাঁকে যে ঘোর দারিদ্র্য ও অনটনের বোঝা বহন করতে হচ্ছিল, তা বন্ধু গৌরদাসকে এক পত্রে তিনি জানাতে ভোলেননি। তিনি লিখেছিলেন: "I composed the poem amidst want and poverty and battalions of sorrows".

কবির মাদ্রাজ-প্রবাসজীবনের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রেবেকা ম্যাকটিভিস্ নামে তাঁর এক ইংরেজ যুবতীর পাণিগ্রহণ। এঁদের দুই পুত্র এবং দুই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু মনোমালিন্য ঘটায় তাঁদের এই এই দাম্পত্য সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অতঃপর তিনি সেইখানেই এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়া (যিনি 'হেন্‌রিয়েটা' নামেই অধিক পরিচিতা) নামে এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন।

এই সময়েই ঘটল মধুসূদনের পিতৃবিয়োগ। তিনি আঁরিয়েতাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে এলেন। এখানে তিনি প্রথমে পুলিস কোর্টের কেরানীর এবং পরে দ্বিভাষিকের পদ পান। এই সময়টাই মধু-কবির জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জল অংশ। বেথুন সাহেবের সুপরামর্শে তিনি বাঙ্‌লা রচনায় আত্মনিয়োগে যখন উন্মুখ হচ্ছেন, ঠিক তখনই রাম-নারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের ব্যাপারে পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে গেল। এই সূত্রেই তিনি একে একে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬১), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ আংশিকক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে তিনি তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য'খানি (১৮৬০) আগাগোড়াই অমিত্রাক্ষর

ছন্দে লিখলেন। এরপর তিনি 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬১), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) এবং 'বীরাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬২) প্রকাশ করেন। কারো কারো মতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদও এঁরই রচনা। কিন্তু নানা কারণে এ-নিয়ে ইদানিং মতভেদ দেখা দিয়েছে।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে মামলা ক'রে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। এর পরেই ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে তাঁর ইংলণ্ড যাত্রা। হেঁরিয়েতা কলকাতায় চরম আর্থিক সংকটে পড়লে পুত্রকন্যাসহ তিনিও ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে ইংলণ্ডে চলে গেলেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি এবার তাঁদের সঙ্গে নিয়েই মধুসূদনকে ফ্রান্সে যেতে হল। সেখানেও চরম আর্থিক বিপর্যয়ে তিনি পড়লেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের আর্থিক সহায়তাদান এই সময় কবিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তিনি ব্যারিস্টার হলেন। এই প্রবাসজীবনেই তিনি পাশ্চাত্যরীতির অনুসরণে বাঙলায় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) রচনা করেন। এর মানসিক প্রস্তুতি অবশ্য তাঁর আগে থেকেই চলেছিল। কারণ, ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন : "I want to introduce the sonnet into our language".

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি তাঁকে সপরিবারে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হ'ল। এখানেও তিনি তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলেন। তবুও তাঁর সাহিত্যচর্চা থেমে থাকেনি। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি হোমরের 'ইলিয়াড' মহাকাব্য অবলম্বনে তাঁর 'হেক্টর-বধ' প্রকাশিত হয়। এছাড়া কতকগুলো অসমাপ্ত কাব্য ও প্রহসনও তিনি রচনা করেছিলেন। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তার কবলিত হয়ে ভেতরে ভেতরে তাঁদের উভয়েরই জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় হেঁরিয়েতার মৃত্যুর ঠিক তিন দিন পরে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন কবি আলিপুরের জেনারেল হাসপাতালে একান্ত অসহায় এবং করুণ পরিবেশে মৃত্যুর কোলে শায়িত হয়ে চিরশান্তি লাভ করলেন। কিন্তু 'শান্তি' কথাটি বোধহয় মধুসূদনের অদৃষ্টে লেখা ছিল না। তাই লোয়ার সার্কুলার রোডের খ্রীস্টানদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করতে গিয়েও আবার বিরোধ বাধে। অবশেষে নিতান্ত অবহেলার মধ্যেই উক্ত সমাধিক্ষেত্রের বাইরে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে এই যুগন্ধর কবির সমাধি রচনা করা হল। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর এর ওপর সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে

হল তাতে কবির আবক্ষ মর্মরমূর্তি স্থান পায়। সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ এই কবিতাটি মৃত্যুর পূর্বে কবিই স্বয়ং রচনা ক'রে গিয়েছিলেন :

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর অতুলনীয় অবদানের কথা জাতি চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখবে। পরিশেষে তাঁর সেই অবদানগুলিকে আমরা সূত্রাকারে উল্লেখ করতে পারি—(১) উন্নতমানের বাঙ্‌লা নাটকের তিনিই পথিকৃৎ—কারণ, সংস্কৃত-রীতির নাট্যরচনায় ক্ষেত্রে বাঙ্‌লা নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। (২) বাঙ্‌লায় পাশ্চাত্যরীতির সার্থক ঐতিহাসিক নাটক তথা ট্র্যাজেডির রূপায়ণ তাঁরই হাতে। (৩) উন্নত-মানের প্রহসন রচনার প্রথম কৃতিত্বও তাঁরই। (৪) বাঙ্‌লা ভাষায় পাশ্চাত্য-রীতির সার্থক আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্যের তিনিই প্রথম কবি। (৫) এদেশে পাশ্চাত্য-আদর্শে রচিত আধুনিক 'গীতিকবিতা', 'সনেট', 'ওড্' এবং 'পত্রকাব্যে'র তিনিই জনক। (৬) মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমিকে কেন্দ্র ক'রে সার্থক দেশপ্রীতির সুর তাঁর কাব্যেই প্রথম শোনা গেল—অথচ, সেখানে কোনো সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায়নি। (৭) তাঁর কাব্য এবং নাটকেই দেশীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি প্রথম বিশ্বমনের নৈকট্য অনুভব করল। (৮) তাঁর কাব্য-নাটকেই সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় দেববাদ-ভক্তিবাদ এবং অদৃষ্টবাদের স্থানে মানুষ এবং ইহলোক আপন স্থানটুকু অধিকার ক'রে নিল। (৯) প্রচলিত সিদ্ধরস এবং রস-সংস্কারের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনিই প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার করলেন। যেমন : 'মেঘনাদবধকাব্যে' রামচন্দ্রকে মহৎরূপে অঙ্কন না ক'রে রাবণকে মহৎ করায় সিদ্ধরসের ক্ষেত্রে এবং উক্ত কাব্যেই বীররস ও করুণরসকে মিশ্রিত করায় প্রচলিত রস-সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হল। (১০) বাঙ্‌লা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা তাঁর আর এক বৈপ্লবিক অবদান।

বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী ধারায় কবির উক্ত অবদানগুলির প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। তাই শুধু কবি কিংবা নাট্যকাররূপেই নয়, সমকালীন যুগের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে উক্ত অবদানগুলির নিরপেক্ষভাবে বিচার এবং বিশ্লেষণ করলেই তাঁর সাহিত্য এবং প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হবে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্টতা

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। সমাজের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এই নবধারায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একদিকে যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, অন্যদিকে প্রচলিত সংস্কারাদি সম্পর্কে তাঁদের মনে একটা প্রশ্নমনস্কতার বাতাবরণও তৈরি হল। ফলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, বাবুসম্প্রদায়ের স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে তর্কবিতর্কমূলক প্রস্তাবাদি যেমন রচিত হতে থাকে, তেমনি সামাজিক নকশা শ্রেণীর রচনা কিংবা প্রহসনও প্রকাশিত হতে লাগল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এইরকম নকশা-রচনার একটা বিশেষ প্রবণতা আমাদের চোখে পড়ে।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু'-ই (১৮৫৩) হল বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক প্রহসন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময়েই রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ-সূত্রে পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে মধুসূদনের যোগাযোগ ঘটে এবং তাঁদেরই অনুরোধক্রমে তিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসন দুখানি রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে সে-দুখানি প্রকাশিত হয়। এগুলি সম্পর্কে আরো নানা তথ্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

এই প্রহসন দুখানি রচনা ক'রে মধুসূদন নিজে অবশ্য তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি—যদিও পরে অনেকের দ্বারাই এগুলি উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল। ২৪.৭.৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন:

"As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that

as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces".

প্রকৃত শিল্পীদের স্বভাব এই-ই। আপন সৃষ্টিতে তাঁরা কোনদিনই তৃপ্তি খুঁজে পাননা। তাই কত সংশোধন, কত সংযোজন, কত বর্জন, কত পরিবর্তন এসবক্ষেত্রে প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে থাকে। যাই হক, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যত৷' বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে তথা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিধারায় নানা কারণেই বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

সেকালে রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং আরও অন্যান্যদের নাটকে নান্দী, সূত্রধার, নটী, বিদূষকের একটা সুস্পষ্ট স্থান দেখা যেত। কাহিনীতে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, আর আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম—এই পঞ্চ নাটকীয় অবস্থা চিত্রিত হত। এদের সঙ্গে 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চ-সন্ধি-সমন্বিতম্'—এই নির্দেশ স্মরণে রেখে একদিকে যেমন মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি এবং নির্বহণসন্ধি নামক পঞ্চসন্ধিকে সমন্বিত করা হত, অন্যদিকে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের মূল উপাদান সহযোগে তাঁরা নাটক রচনায় প্রয়াসী হতেন! এমন কি সামাজিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত নাটকে ঐসব লক্ষণকে তারা অতিক্রম করে যেতে পারতেন না। ফলে সেসব নাটকে বহুক্ষেত্রেই দৃশ্যবিভাগ দেখা যেত না, সংলাপে আসত অলংকার-বাহুল্য, সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের অতিরেক এবং তরল উচ্ছ্বাসময়তা। বিষাদাত্মক নাটক তো সংস্কৃতরীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই ছিল। পাশ্চাত্য-ভাবধারায় পুষ্ট মধুসূদনের কাছে বাঙ্‌লা নাটকের এই গতানুগতিকতা ভালো না লাগবারই কথা। তিনি তাই একে পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী অঙ্ক-দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে, ত্রয়ী ঐক্যে সুসংবদ্ধ ক'রে, বাস্তব ও স্বাভাবিক সংলাপের অবতারণা ক'রে, তীব্র ঘাতপ্রতিঘাত-সহযোগে ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারিত ক'রে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে'র হাত থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) কিংবা 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে সংস্কৃতানুকারিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। অথচ, 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় এই দুর্লভ সাফল্য একদিকে সর্বপ্রথম যেমন সূচিত হল, অপরদিকে

পাশ্চাত্যরীতির যথাযথ অনুসৃতিও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

মধুসূদনের নাটক কিংবা কাব্য—সমগ্র রচনাবলীতেই দেখি তিনি পুরাণ কিংবা ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে অতীতের রাজ্যে পরিভ্রমণ করছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনেই দেখতে পাই তাঁর মন সর্বপ্রথম বর্তমানকাল তথা সমকালীন সমাজকে অবলম্বন করেছে। সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও প্রীতির যে অন্ত ছিল না, তা এই প্রহসনখানি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এটির শৈল্পিক সাফল্যের এটাও একটা বড় কারণ। পক্ষান্তরে, ইতিহাস-পুরাণের রাজ্যে বিচরণ কবির ঠিক আন্তরিক আগ্রহের ফল নয়, ঐসব রাজ্যের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও ছিল না। বরং এহেন প্রবণতা তাঁর সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যের অনুসৃতিরই ফলস্বরূপ—ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন জাগে, সমাজের প্রতি তাঁর এই আন্তরিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি সামাজিক নাটক রচনায় আর প্রয়াসী হলেন না কেন? এর উত্তরে বলা যায়, নাটকরচনার সূত্রেই বাঙলা-সাহিত্যের আঙিনায় মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব ঘটলেও, তাঁর মনটি যে প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারের নয়—কবির, তা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তিনি যখন 'পদ্মাবতী' রচনাকালে আকস্মিকভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার ক'রে ফেললেন এবং সেখানে আংশিকভাবে প্রয়োগ ঘটিয়ে তাকেই তিনি তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বাহন বলে সনাক্ত ক'রে নিতে পারলেন, তখন তাঁর পক্ষে নাটকের ক্ষেত্র ক্রমশ পরিত্যাগ ক'রে কাব্যরচনায় অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে আর একটি প্রত্যক্ষ কারণও যুক্ত হয়েছিল। সেটি হল, তাঁর নাটক ও প্রহসন সে-সময় উন্নতরুচির দর্শকের অভাবে সমাদৃত না হওয়া। এছাড়া কবির ব্যক্তিগত জীবনধারাকে লক্ষ্য করলেও আমরা বুঝতে পারি, এখানকার সামাজিক-পরিবারিক পরিবেশে সুস্থিত জীবনযাপন করা তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। ফলে গম্ভীররসের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করতে গেলে যে-ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন, তা তিনি আহরণ করবেন কোথা থেকে? তার ওপর সমকালীন সমাজের সমতাল জীবনে প্রাত্যহিক জীবনধারার যে বিবর্ণতা তথা উদ্দামহীনতা বর্তমান ছিল, তাকে পুরাণ-ইতিহাসের যুদ্ধ-সংঘাতমূলক কাহিনীর বর্ণচ্ছটা দিয়ে ঢেকে দিতেও তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। অথচ, প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না। শুধুমাত্র কিছু কিছু

সামাজিক অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলে, লঘু বিদ্রূপ-বর্ষণে তাকে হাস্যরসে নিষিক্ত করতে পারলেই প্রহসনকারের প্রাথমিক কর্তব্যটুকু শেষ হয়ে যায়। আরও একটা কথা, মধুসূদনের নাট্যচর্চার সময়সীমাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে গম্ভীররসের নাটক লেখার এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে প্রহসন রচনা করার প্রচলিত যে রীতিটি ছিল, তাকেও তিনি অস্বীকার করার তীব্র কোন মানসিক তাগিদ হয়ত অনুভব করেননি।

সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে সে-সময় প্রহসন রচনা করা হলেও, সেখানে সাধারণত সমাজের বিশেষ কোন একটি সমস্যাকেই ফুটিয়ে তোলা হত। যেমন: বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনে মধুসূদন যুগসন্ধিজাত আদর্শের সংঘাতকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে সমাজের তৎকালীন সামগ্রিক সমস্যাই ফুটে উঠেছে; খণ্ডিত কোন সমস্যার কেন্দ্রে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকেনি।

এক্ষেত্রেও প্রহসনকার যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ—এককথায় তন্ময় বা objective। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় তিনি মূলত যাদের কথায় ও কাজে অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি নিজেও একদা সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ, তাদের ব্যঙ্গবাণে আহত করতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বাধেনি! এটি তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মূলত ছিল মন্ময় বা Subjective। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তীকালে তিনি ক্লাসিক-সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে অর্জন করেছিলেন। আবার, মৌলিক সংস্কারকে অর্জিত সংস্কার যে সব সময় দাবিয়ে রাখতে পারে না—তার পরিচয়, তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রেই আমরা দেখতে পাই। ঐ সব চরিত্রে তাঁর বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় থাকলেও, আত্ম-প্রতিফলনের স্বাক্ষরও যত্রতত্র নিহিত রয়েছে। কিন্তু সেই প্রবণতার হাত থেকে আলোচ্য প্রহসনখানি আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত।

প্রহসনে হাস্যরস থাকবেই, কিন্তু নিছক হাস্যরস সৃষ্টির সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রহসনখানি যে রচিত হয়নি, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যেতে পারে। আসলে, সামাজিক অসংগতি ও জীবন বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে লেখকের সত্য-আবিষ্কার করার একটা সচেতন প্রয়াসের স্বাক্ষরও এখানে বর্তমান রয়েছে। কোনো কিছুকে যথার্থভাবে পেতে গেলে গভীর ত্যাগস্বীকারের মধ্যে দিয়েই তা পেতে হয়। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে অনুকরণসর্বস্ব ক'রে তুললে, তা প্রকৃত-

পক্ষে যে কতখানি হাস্যকর হতে পারে, সেই জীবনসত্যকেও তো তিনি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন!

আর রয়েছে এর ভাষাপ্রয়োগের দিক। ক্লাসিক-আদর্শের অনুবর্তী কবির কাছে লৌকিক, চলিত তথা আঞ্চলিক রীতির ভাষা আদৌ আদরণীয় ছিল না। কিন্তু এই প্রহসনের বিভিন্ন সংলাপে সেই চলিতরীতির ভাষাকে তিনি যে কত দক্ষতার সঙ্গে স্থান ক'রে দিয়েছেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। দুখানি প্রহসন ছাড়া, তাঁর সাহিত্যধারায় অনুরূপ নিদর্শন আর কোথাও-ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, বাবুদের ভাষায় ইঙ্গ-বঙ্গীয় বুলির মিশ্রণ, মুটিয়াদের ভাষায় যশোর-খুলনার আঞ্চলিক কথ্যরীতির প্রয়োগ, সার্জেন্টের মুখে ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হিন্দি ও ভাঙা বাঙ্‌লার অতিরেক, কুলললনাদের ঘরোয়া আলপনের নিখুঁত ভঙ্গিমা—সেই কথ্যরীতির সংলাপেও যথেষ্ট বৈচিত্র্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছে। এইভাবেই আলোচ্য প্রহসনখানি নানা দিক দিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শ্রেণীবিচার

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' নাটক, প্রকরণ, ঈহামৃগ, ডিম, সমবকার, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ এবং বীথী—এই দশ রকমের রূপক বা দৃশ্যকাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ মুখ্যত আখ্যানবস্তু, নায়কচরিত্র, উদ্দিষ্ট রস এবং গৌণত অঙ্ক-সংখ্যা, বৃত্তি ও গঠনরীতির ওপর নির্ভর ক'রে করা হয়েছে। রূপকগুলির মধ্যে প্রথম দুটির অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ, পরের দুটির চার, সমবকারের তিন, অবশিষ্টগুলির এক। প্রহসনের স্বরূপটিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আগে প্রকরণ, ভাণ ও বীথীর স্বরূপটিকে বুঝে নিতে হবে—অন্যগুলির আলোচনার এখানে কোনও প্রয়োজন নেই। প্রকরণের নায়ক সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ-চরিত্র হয়। প্রথমে তার ভাগ্যবিপর্যয় চিত্রিত হলেও ধীরে ধীরে কিভাবে সে তা জয় করল, তা-ও এতে দেখান হয়ে থাকে। রাজপরিবার বা রাজবংশের কোনো কাহিনী বা চরিত্র এতে আদৌ রূপায়িত হয় না। 'মালতীমাধব' বা 'মৃচ্ছকটিক' এই শ্রেণীর রূপকের দৃষ্টান্ত। ভাণ মূলত কোনো ধূর্ত চরিত্রকেন্দ্রিক এবং একোক্তিমূলক। রঙ্গমঞ্চে কোনো নেপথ্যচরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এক্ষেত্রে কাহিনীকে রূপায়িত

করা হয়। বীথীতে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা দুই-তিন হতে পারে এবং বিভিন্ন রসের অবতারণাও এতে ঘটতে পারে। এদের মধ্যে একমাত্র প্রহসনই হচ্ছে উল্লেখ-যোগ্য লঘু হাস্যরসাত্মক নাটিকা। নিচে তার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক A. Nicoll তাঁর 'The Theatre and Dramatic Theory' গ্রন্থে প্রহসনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : "Generally, the term was applied to an after piece, or else to a piece inserted within an evening's performance, generally it tended to be associated with short plays, not more than three-acts in length."

'The Sanskrit Drama' গ্রন্থে A. B. Keith এরই পরিচয় আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বলেছেন : "The farce, Prahasana,…has every sign of popular origin and vogue. The subject is the poet's invention ; it deals essentially with the tricks and quarrels of low characters of every kind. There is but one act…the comic sentiment predominates."

কেউ কেউ "ফার্স বা প্রহসনে বাহ্য ঘটনার উদ্ভট অতিচার, নাটকীয় অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে অদ্ভুতত্ব, ঘটনার উপর রঙ্ চড়ানোর অতিরঞ্জন, পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া ও কার্যকলাপে অস্বাভাবিকতা এবং তাদের সংলাপে 'পান' (Pun)-এর আতিশয্য, তাদের কথা-বলার অদ্ভুত ভঙ্গিমায় পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংকেত-করণ (allusion), ও ভাঁড়ামিও লক্ষ্য" করেছেন। তাঁদের মতে, "Farce generally means low comedy, intended solely to provoke laughter through gestures, buffoonery, action, or situation, as opposed to comedy of character or manners."

অনেকে আবার প্রহসনকে নিছক ভাঁড়ামিসর্বস্ব বলে মনে করেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'রহস্য সন্দর্ভে' এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা—শক্তি ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে সেইরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর।"

প্রহসনকে এইভাবে নানাজনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং তার স্বরূপ-ব্যাখ্যানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের অভিমতগুলির মধ্যে থেকে তথ্যচয়ন ক'রে সূত্রাকারে ব্যক্ত করলে দাঁড়ায়, প্রহসনের (১) বিষয়বস্তুটি জনপ্রিয় হবে

এবং (২) তা নাট্যকারের কল্পিত তথা অতিরঞ্জিত হবে। (৩) আকারে এটি বড় হবে না, তিন অঙ্কের মধ্যে তা সীমিত থাকাই বাঞ্ছনীয়—একাঙ্কিকা হলো খুবই ভাল হয়। (৪) সাধারণ মানুষের দ্বারা আচরিত প্রতারণা ও কলহই মূলত এর উপজীব্য বিষয়। (৫) রসপরিণতির দিক থেকে স্থূল কৌতুকদৃষ্টিই এতে প্রাধান্য পাবে। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের পরিবর্তে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির দিকেই তাই তাই এর প্রবণতা বেশি। (৬) প্রহসনে সাধারণত কোন কাহিনী থাকে না এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের মধ্যে তেমন কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় না। (৭) চরিত্রগুলির বিশেষ এক-একটি দিককেই এতে তুলে ধরা হয় এবং (৮) নাট্যিক দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির অবকাশ এতে বিশেষ মেলে না।

এবারে পাশ্চাত্য-মতে লঘুরসাত্মক নাট্যরূপগুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করব। উক্ত মতে লঘুরসের নাটক ফার্স (Farce), বারলেস্ক (Burlesque), এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা (Extravaganza) এবং কমেডি (Comedy)—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এর মধ্যে ফার্স অনেকটা প্রহসনেরই অনুরূপ, বারলেস্কে থাকে মূলত ব্যক্তিগত আক্রমণ, আর এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জার বিষয়বস্তু হচ্ছে সচরাচর পৌরাণিক, কিন্তু নানারকম কথার খেলা এতে এক ধরনের হাস্য রসের জন্ম দেয়। কমেডিরই সাহিত্যমূল্য এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর এক প্রান্তে থাকে বাহ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং অপর প্রান্তে থাকে পাত্রপাত্রীদের জীবনের সুখ, দুঃখ ও বেদনা। উভয় প্রান্তের আলোড়নে নাটকীয় ঘটনা ক্রমশই জটিল হতে থাকে। অবশ্য সেই জটিলতা নাটকের পরিসমাপ্তিতে আনন্দ ও মধুররসেরই সঞ্চার করে। কমেডি সম্পর্কে তাই এক কথায় বলা যায়: "In Comedy the poet imitates the action of the people in middle or low condition. The ending of the Comedy is happy."

'Encyclopedia of literature' (Vol. 1) গ্রন্থে কমেডির সাহিত্যমূল্য যে পাত্রপাত্রীদের অঙ্গভঙ্গিমার চেয়ে তাদের বাচনিক রসসৃষ্টির ওপরই বেশি পরিমাণে নির্ভর করছে, সেকথা পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "Comedy at least depends primarily on verbal humour and only secondarily, if at all, on physical effects. It therefore has value as literature, as distinct from spectacles-

which rely largely on mime, buffoonery, burlesque, dancing or music."

Moliere তাঁর একটা নাটকেও কমেডির উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন : "to enter rightly into the ridiculous aspects of mankind and to represent people's defects agreeably on the stage."

সমালোচকেরা কমেডিকে আবার নানা ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন : (১) Romantic Comedy—কবিত্ব ও কল্পনার প্রাচুর্যে ভরা কমেডি। (২) Comedy of Manners—সামাজিক রীতিনীতিকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়ে থাকে। (৩) Comedy of Intrigue—ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকেন্দ্রিক কমেডি। (৪) Comedy of characters—মানবজীবনের নানা দোষ-গুণ বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এখানে প্রকাশিত হয়। (৫) Low Comedy—নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি প্রকাশ করাই এর লক্ষ্য।

প্রহসন এবং কমেডির এই বিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র শ্রেণীবিচারে প্রবৃত্ত হব। প্রথমেই এটিকে প্রহসন বা ফার্স রূপে বিচার ক'রে দেখা যাক। মধুসূদন একাধিক চিঠিপত্রে এটিকে 'প্রহসন' বা 'ফার্স' বলেই উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্যজীবনের সংঘাতে নতুন সভ্যতার নামে এক শ্রেণীর তরুণের সংঘবদ্ধ যে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা, তাকেই মধুসূদন এখানে ব্যঙ্গ করেছেন। এইসব ইয়ং বেঙ্গলীয়দের কালাপাহাড়ী কাণ্ড সামাজিক সমর্থন লাভ করেনি, পরন্তু এদের কার্যকলাপ ছিল সমাজের চক্ষুশূল। কাজেই এদের নিন্দাবাদ খুব সহজেই সামাজিক সমর্থন লাভ ক'রে প্রহসনের উপযোগী জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়টিকে নাট্যরূপ দেবার জন্যে নাট্যকারকে নবকুমার-কালীনাথ-কর্তামশায়ের কাল্পনিক অথচ বাস্তবানুগ কাহিনীকে, অন্তত কাহিনীর একটা ক্ষীণ সূত্রকেও, সৃষ্টি করতে হয়েছে। নাটকটি আকারেও সংক্ষিপ্ত—মাত্র দুটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ। তা-ও সূক্ষ্মবিচারে এটি একাঙ্কিকারূপেই পরিগণিত হবার যোগ্য। প্রতারণা-কলহের চিত্র এতেও আছে। কর্তামশায়কে কালীনাথের মিথ্যা পরিচয়দান, বাবাজী-সার্জেন্ট-চৌকিদার সংবাদ, কিংবা বারবিলাসিনীদের দ্বারা বাবাজীর অপমান, মত্ত অবস্থায় নবকুমারের বাড়ি ফিরে হল্লা করা ইত্যাদি ঘটনার কথা সে-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে। ঐসব ঘটনায় স্থূল হাস্যরসের উপাদানও ছড়িয়ে রয়েছে অনেক। প্রহসনের মতোই

নাট্যিক ঘটনাসমূহ কার্যকারণের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে, চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে সম্বন্ধ লাভ ক'রে, একটা পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর জন্মদান এখানেও করেনি। এই পর্যন্ত প্রহসনের সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এর অতিরিক্ত অনেক বৈশিষ্ট্যের সন্ধানও এখানে করা চলতে পারে।

যেমন, প্রথমেই চরিত্র-চিত্রণের কথা ধরা যাক। পূর্বেই বলেছি প্রহসনের চরিত্রগুলির শ্রেণীলক্ষণ প্রকাশিত হওয়াই বড় কথা—তার বেশি দায়িত্বভার প্রহসনকারকে গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে চরিত্রগুলির উক্ত লক্ষণ প্রাধান্য পেলেও, ব্যক্তিলক্ষণ একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নবকুমার, কালীনাথ এবং জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অন্যান্য সভ্যবৃন্দ একই গোষ্ঠীর এবং একই মতবাদের মানুষ হলেও স্বল্প অবকাশে মধুসূদন এদের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের দিকটিকেও নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবকুমার-চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধীশক্তিসম্পন্ন, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তার আছে। সে ধীরভাবে ভাবতে পারে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কৌশল-উদ্ভাবনেও তার জুড়ি নেই। অপরের চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে সে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এতগুলি গুণের সঙ্গে দোষও রয়েছে তার চরিত্রে। সে প্রবঞ্চক। পিতাকে বন্ধুর মিথ্যা-পরিচয় দিতে তার বাধে না। স্বামীর কর্তব্যপালনে সে পরাঙ্মুখ। মদ্যাসক্তি আর বারাঙ্গনাসেবা তার চরিত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। এরসঙ্গে রয়েছে তার অন্ধ বিলেতি-অনুকরণ প্রবণতা। যার প্রভাবে আমাদের সমাজে বোনের প্রতি ভাই-এর কি ধরনের আচরণ করা উচিত, তা-ও সে ভুলে গেছে! সব মিলিয়ে চরিত্রটি দোষে-গুণে এমন একটা রক্তমাংসের সজীবতা পেয়েছে, যা প্রহসনে দুর্লভ। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কালীনাথ। এ-চরিত্র নবর মতো উজ্জ্বল না হলেও, দোষে-গুণে অনেকখানি সজীবতা পেয়েছে। নবর মতো ইংরেজি-শিক্ষা এ-ও লাভ করেছে; কিন্তু তার স্মরণশক্তি যে বিশেষ প্রখর নয়, তা আমরা তার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গীতগোবিন্দে'র বিকৃত তথা এলোমেলো উচ্চারণেই টের পেয়েছি। বারাঙ্গনাপল্লীতে হাতে-নাতে ধরা পড়বার পর সে বাবাজীকে ঘা-কতক দিয়েই বিদায় করতে চেয়েছে। এ সিদ্ধান্ত তার অপরিণাম-দর্শিতার পরিচায়ক। নিজের পরিচয়দান প্রসঙ্গে সে যখন বলে: "সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের

আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই"—তা তার নির্লজ্জ রসিকতারই পরিচয় দেয়। শব্দ নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলতেও সে অত্যন্ত দক্ষ। পান খেয়ে মুখের মদের গন্ধ দূর করবার পরামর্শ নব তাকে দিতে গেলে সে বলে: "আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তো চাই!" চৈতন্য, শিবু, বলাই, মহেশ প্রভৃতি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অন্যান্য সদস্যরাও আছে। কিন্তু খুব অল্প কথাবার্তার মধ্যেই মধুসূদন এদের চারিত্রিক-স্বাতন্ত্র্যের আভাসও অনেকখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। নবর নেতৃত্বে আস্থা আছে চৈতন্যের, আস্থা ছিল শিবুরও; কিন্তু মানসিক স্থিতিস্থাপকতার অভাবে অতি দ্রুত তার মত-পরিবর্তন ঘটে যায়। নবর সাফাই গাওয়া সম্পর্কে 'দ্যাট্‌স এ লাই' বলতে তার বাধে না। এর পরেই মদের গ্লাসে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার অশালীন ইতরতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বলাই নবকে ঈর্ষা করে। মহেশ আবার নবকে বাদ দিয়ে সভার কাজ চালানোর ব্যাপারে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখিয়েছে। কর্তা-চরিত্র মামুলী। কিন্তু বৈষ্ণব ভাবাতিরেক তাঁকে একটা চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বাবাজী-চরিত্র উপরে ধার্মিক, কিন্তু ঘুষ খেতে কিংবা বারাঙ্গনাদের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাতে তার বাধে না। উপরে-ভিতরে তার এই বৈসাদৃশ্য তাকে স্বতন্ত্র একটা চারিত্রিক মর্যাদা দিয়েছে। নারীচরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রহসনকার তাদের অবশ্য মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীভুক্ত ক'রে দেখেছেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেননি। ছোট ছোট আরও বহু চরিত্র রয়েছে। কিন্তু তুলির সামান্য আঁচড়ে প্রহসনকার তাদের এমন জীবন্ত ক'রে তুলেছেন যে, একটি চরিত্র অনায়াসেই সমশ্রেণীর আর একটি চরিত্র থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য অনেকখানিই অর্জন ক'রে নিতে পেরেছে।

এদের সংলাপও আদৌ মামুলী ধরনের নয়। সার্থক নাটকীয় সংলাপের বড় গুণ সংক্ষিপ্ততা, স্বাভাবিকতা, চরিত্রানুগামিতা এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতাকে দ্যোতিত করবার ক্ষমতা। বলা বাহুল্য, প্রহসনের সংলাপ অনেকক্ষেত্রেই এতখানি অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনের সংলাপ সেদিক থেকে আশ্চর্যজনকভাবে জীবন্ত। চরিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরকম কিছু কিছু সংলাপের দৃষ্টান্ত দিয়েছি—এখন আর কিছু উল্লেখ করা হবে। কর্তা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। তাঁর ভাষায় ভক্তির অতিরেক, তৎসম-সমাসবদ্ধ শব্দকে আশ্রয় ক'রে সুন্দর ফুটে উঠেছে। জয়দেবের নামটুকু শুনেই ভাবে তিনি আত্মহারা হয়ে ওঠেন অতি সহজেই: "জয়দেব? আহা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-

সাগর।" আবার নবকুমার মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফিরলে স্ত্রীর সঙ্গে যখন তিনি কথাবার্তায় রত হন, তখন তৎসম শব্দের প্রয়োগ আশ্চর্যজনকভাবে কমে যায়। তিনি বলেন: "ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পারনি?" সার্থক নাটকীয় সংলাপ এমনই হয়ে থাকে। সারজেন্ট বিদেশী মানুষ! তার সংলাপে ইংরেজির বাহুল্য থাকবেই। কিন্তু ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাবাজী কিংবা চৌকিদারের সঙ্গে কথোপকথনে ভাঙা ভাঙা হিন্দি কিংবা বাঙ্‌লার প্রয়োগ আদৌ অসংগত ঠেকে না। এদেশীয় মানুষদের প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাবও ফুটে ওঠে কোন কোন সংলাপে যেমন, "ইউ স্টুটি ডেভল্‌। কেস্কা চোরি কিয়া?" মুটিয়াদের সংলাপে যশোর-খুলনার আঞ্চলিক কথ্যভাষার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন: "দেখ্‌ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে স্যেলে।" এভাষায় শুধুই আঞ্চলিকতার চিহ্ন নেই, রয়েছে তাদের ব্যক্তিজীবনের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেও দীর্ঘশ্বাস! "ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্‌ শালা রাগতো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়"—নবকুমারের এই সংলাপ তার পাশ্চাত্য-অনুকরণসর্বস্ব মনটিকে আমাদের সঠিকভাবেই চিনিয়ে দেয়। নারীদের সংলাপেও প্রহসনকার যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। যেমন "চুপ্‌ কর্‌ লো, চুপ্‌ কর্‌, ঐ শোন্‌, মা ডাকচেন"—প্রসন্নর এই উক্তিতে সম্বোধনের মেয়েলী ভঙ্গীটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বারাঙ্গনাদের কথোপকথনে তাদের নিজস্ব বাচনরীতিটিও যথাযথ-ভাবে অনুসৃত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার সংলাপগুলোকে আশ্চর্যরকম জীবন্ত ক'রে তুলেছে। এরপর আর একটি ভিন্নধর্মী সংলাপের কথা ধরা যাক। মত্ত অবস্থায় নবকুমার যখন বাড়ি ফিরল, তখন নৃত্যকালী প্রভৃতিরা লুকিয়ে তামাশা দেখতে চাইল: কিন্তু নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল: "আর আমার ওসব ভাল লাগে না।" উক্তিটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর ব্যঞ্জনা অসীম। আবার স্বামীকর্তৃক অবহেলিতা স্ত্রীর মুখে ঐ অবস্থায় এই সংলাপ একান্ত স্বাভাবিক, সংগত ও যথাযথ। প্রহসনের একেবারে শেষে তার সংলাপ অবশ্য বক্তৃতাধর্মী হয়ে গেছে। কিন্তু নববাবুদের আচার-আচরণের ধ্বংসাত্মক দিকটিকে ফুটিয়ে তুলতে এর জুড়ি নেই।

চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপে নৈপুণ্যসাধনই শুধু নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গ্রীক নাটকসুলভ ত্রয়ী ঐক্যও এখানে রক্ষিত হয়েছে। সমস্ত ঘটনা ঘটেছে উত্তর কলকাতারই একটা বনেদী অঞ্চলে। সুতরাং স্থানগত ঐক্য

রক্ষিত হল। কর্তার কথাতে জানতে পারি ঘটনার সূচনাকালে বিকাল পাঁচটাও বাজেনি। আর ঘটনার যখন শেষ, তখন বাড়ির কর্তার রাতের খাওয়া হয়নি। তাই অনুমান, তখন রাত দশটা-এগারোটার বেশি হবে না। অতএব দেখা গেল সম্পূর্ণ ঘটনাটা ঘটে গেছে পাঁচ-ছ ঘণ্টার মধ্যে। এইভাবে কালগত ঐক্যও রক্ষিত হল। ঘটনাগত ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কর্তার সন্দেহের উদ্রেক, দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্তাকর্তৃক প্রেরিত হয়ে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সামনে বারাঙ্গনা ও পুলিসের সহযোগে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ। এটাকে আপাতদৃষ্টিতে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হতে পারে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে বাবাজীর হাতে নব-কালীর ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনা। নব উৎকোচ দিয়ে বাবাজীকে বশীভূত করায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা মূল ঘটনাধারার সঙ্গে আবার সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উক্ত সভার উৎসবে নব্য সভ্যতার স্বরূপটি ফাঁস হয়ে গেল। এটাই নাট্যঘটনার ক্লাইম্যাক্স। অতঃপর দ্বিতীয় দৃশ্যে যা ঘটল তা নাটকের পরিভাষায় 'fall of action'! সমস্ত ঘটনা এইভাবে একটা ঘনপিনদ্ধ রূপ লাভ করেছে। একমাত্র বাবাজীর পুলিসী অভিজ্ঞতাটিকেই কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এ ত্রুটিও এমন কিছু মারাত্মক নয়।

প্রহসনটি আগাগোড়াই কর্মচঞ্চল। কর্তাকে প্রতারণা, সভার নামে চরম উচ্ছৃঙ্খলা, নবর মাতলামি, বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভ—এমনি নানান ঘটনা দর্শকদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নাট্যিক দ্বন্দ্বেরও অভাব নেই এখানে। কর্তা এবং নবর জীবনাদর্শগত দ্বন্দ্ব এই প্রহসনের মূল ভিত্তি। এছাড়াও বাবাজী ও বারাঙ্গনাদের কথাবার্তায় উভয়ের জীবনদৃষ্টি ও রুচিগত বৈপরীত্যকে অনুভব করা যায়। সার্জেণ্ট-বাবাজী-সংঘাতে রয়েছে উৎপীড়ক-উৎপীড়িতের দ্বন্দ্ব। নব এবং তার অনুগামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের স্বাভাবিক অবকাশ না থাকলেও, তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটা গোষ্ঠীর রূপায়ণ ক'রে প্রহসনকার সেখানেও যেন দ্বন্দ্বের এক ঝলক একটা ঝোড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কর্তা ও নবদের জীবনাদর্শগত যে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব, তা প্রথম ও শেষ দৃশ্যে উপস্থিত থাকলেও, মধ্যের দুটি দৃশ্যে অনুপস্থিত। আর এই কারণেই এখানে একটা অখণ্ড কাহিনী গড়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি।

ছোট্ট এই প্রহসনটিতে অনেক নাটকীয় কৌশলও অনুসৃত হয়েছে। যেমন কোন ভণিতা বাদ দিয়ে ঘটনার সূচনা, কিংবা এক এক ক'রে বাবাজীর বিচিত্র

অভিজ্ঞতালাভ নাটকীয় কৌতূহলকেই বাড়িয়ে তোলে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অপদস্থ হতে হতে বাবাজী যখন দূরে আলো দেখে একটু আশান্বিত হল, ঠিক তখনই মূর্তিমান বিপদের মত হাজির হয়েছে পুলিস। এইসব ঘটনায় নাট্যরসের সঙ্গে ব্যঙ্গরস অপূর্বভাবে মিশ্রিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ মাংস, বরফ-বেলফুলওয়ালা, বারাঙ্গনা প্রভৃতি দর্শনে বাবাজীর উত্তেজনা ও ভাবাবেগের উত্থান-পতনের দৃশ্যটিও আমাদের মনে নাট্যরসের একটা অনুপম আস্বাদন নিয়ে আসে। মাতাল নবকুমারের অসংলগ্ন কথাবার্তার নাট্যগত আবেদনও বড় কম নয়।

সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে পরিশেষে আমরা দেখতে পাব 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় প্রহসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানই বর্তমান আছে। যেমন, ইয়ং বেঙ্গলীয়দের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন ক'রে তাদের নানাবিধ অসংগতিকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তীব্র হলেও রসপরিণতিতে তা লঘু কৌতুকময়তাকে কোথাও অতিক্রম ক'রে যায়নি। প্লটে অভিনবত্ব অবশ্য তেমন কিছু চোখে পড়ে না। তবুও নানা ঘটনার সহযোগে তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। ঘটনাগুলিও পূর্ণাঙ্গ আকারে ব্যক্ত না হয়ে আভাসদানের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। এর ফলে স্বল্প পরিসরে প্রহসনটির রূপদান করাও সম্ভবপর হয়েছে। পরিসর সীমিত বলেই সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণের অবকাশ এতে নেই। ঘটনায় আকস্মিকতার সঞ্চার ক'রে নাটকীয় কৌতূহলকে অবশ্য এখানে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ক'রে ঘটনাকে এখানে কোথাও জটিল ও বিস্তৃত ক'রে তোলা হয়নি।

সেটুকুই অবশ্য এখানে সব নয়। কমেডিরও কিছু কিছু লক্ষণ এতে খুঁজে পাওয়া যাবে। কমেডির মতো এটিও সাধারণ মানুষের জীবনকেন্দ্রিক লঘু হাস্যরসাত্মক রচনা। যদিও কমেডি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গেই তুলনীয়। সেখানে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার অবতারণা ক'রে, চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ঘটিয়ে কাহিনীকে জটিল ও বিস্তৃত ক'রে তোলা হয়—ফলে আয়তনে তা সংক্ষিপ্ত হতে পারে না। সেদিক থেকে তাই তুলনীয় না হলেও, আলোচ্য প্রহসনে কমেডির মতো চরিত্র-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বৈষ্ণব বাবাজী, মাতাল, পুলিস, বারাঙ্গনা, মুটিয়া, বেয়ারা, খানসামা ইত্যাদি কত বিচিত্র শ্রেণীর চরিত্রেরই না এখানে অবতারণা করেছেন প্রহসনকার! কমেডির মতো সূক্ষ্ম চরিত্রবিশ্লেষণের

এখানে যদিও অবকাশ নেই, তবুও তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে, এমনও নয়। বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের ঘটনা মূল ঘটনাধারার গতিকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করলেও প্লটে কমেডিসুলভ গতিশীলতা যে একেবারেই নেই, তা-ও বলা চলে না। অবশ্য কমেডিতে নানাবিধ বাধা সমুপস্থিত হয়ে কাহিনীতে যেভাবে গ্রন্থিবহুলতার সৃষ্টি করে, তার একান্ত অভাব আমরা এখানে দেখতে পাই। কাজেই দু-একটি গৌণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও এটিকে 'প্রহসন' আখ্যা দিতে আমাদের বাধা নেই। যদিও প্রহসন ছাড়াও কমেডির, বিশেষত 'কমেডি অব ম্যানার্স'-এর, কিছু কিছু লক্ষণ এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কথাবস্তু-অনুসরণ

প্রথমাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমারের বাইরের ঘর। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কালীনাথ তাকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র এক জরুরী বৈঠকে ডেকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে শুনলে, তার বাবা অর্থাৎ সংসারের কর্তামশাই, অনেক দিন পর বৃন্দাবন থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছেন। ছেলের গতিবিধির ওপর তাঁর কড়া নজর! এই অবস্থায় তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে তো আর সভায় যাওয়া চলে না! কালীনাথ পড়ল মহা ফাঁপরে। কারণ, নবকুমার সভায় মোটা চাঁদা দেয়—তাকে না হলে সভা অচল। সে জানালে এইসব দেখে তার গলা কাঠ হয়ে উঠেছে, তাই তাকে মদ খেতে হবে। বাড়ির চাকর বৈদ্যনাথ মদ দিয়ে গেল। কালীনাথ মদ খেয়ে বেসামাল হবার উপক্রম করলে নবকুমার তাকে সামলাতে লাগল এবং পান খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে বলল। ওদিকে বৈদ্যনাথ সংবাদ দিল কর্তা বাইরে আসছেন। নবকুমার চকিতে একটা উপায় বার ক'রে ফেলল, যাতে সভায় উপস্থিত হওয়ার বাধাটুকু দূর হয়ে যায়। সে কালীনাথকে জানালে তার বাবা নিজে পরম বৈষ্ণব বলে, বৈষ্ণবদের প্রতি একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। কাজেই সে-ও নিজের বাবার পরিচয় না দিয়ে তার এক পরম বৈষ্ণব খুড়োমশাই ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভাইপো বলেই যেন নিজের পরিচয় দেয়। বৈষ্ণবদের প্রিয় গ্রন্থ হিসেবে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নাম দুটিও তাকে শিখিয়ে দেওয়া হল। তার পরিচয় পেয়ে কর্তা খুব খুশি। সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য উল্লেখ না ক'রে

তাঁকে জানানো হল, সেখানে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতি মশায়ের অধীনে সংস্কৃত-বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করা হয়। কিন্তু সেখানকার পাঠ্যবিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে স্মৃতিবিভ্রাটবশত সে বলে ফেললে: "শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী।" এর ফলে যে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হল, তা অবশ্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সুকৌশলে সামাল দিল নবকুমার। অগত্যা তাদের সভায় যাবার অনুমতি মিলল। বেরোবার পরেই কর্তার মনে সন্দেহ জাগায় তিনি জনৈক বৈষ্ণব বাবাজীকে প্রকৃত সংবাদ জানবার উদ্দেশ্যে তাদের পিছনে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন।

। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র খোঁজে বাবাজী সিক্‌দারপাড়া স্ট্রীটে হাজির হয়ে এক বাড়ির দরজায় ঘা দিল। সে ঠিকমত না জানলেও এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বারাঙ্গনাপল্লী। কাজেই মাতাল-সন্দেহে সে ঐ বাড়ির মেয়েদের কাছে গালি খেল। এর পরেই একটি লোককে সেদিকে এগিয়ে আসতে দেখে বাবাজী কিছুটা আশ্বস্ত হলেও লোকটা আসলে ছিল একজন মাতাল—সুতরাং কপালে তিলক ফোঁটা থাকায় তার কাছেও সে 'যাত্রার সং'রূপে অপদস্থ হল। এরপর থাকি ও বামা নামে দুজন বারবিলাসিনীকে দেখে সে মুগ্ধভাবে কিছুক্ষণ তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাল এবং 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র খোঁজ জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তারা ধরে নিল 'তরঙ্গিণী' নামে তার নিখোঁজ বৈষ্ণবীটির সে খোঁজ করছে এবং পাঁচ সিকে পেলেই থাকি ভেক নিয়ে তার বৈষ্ণবী হয়ে যেতে পারে বলে কিছু আদিরসাত্মক রসিকতাও করল। এমন সময় পাহারা দিতে বার হওয়া সারজেন্ট-চৌকিদারের কবলে সে পড়ে গেল। সারজেন্ট চুরির দায়ে তাকে ধরল এবং তার ঝুলি ধরে টানাটানি করতে লাগল। ঝুলিতে চারটে টাকা ছিল। সেটা সে সারজেন্ট-সাহেবকে ঘুষ দিতেই বেকসুর খালাস খালাস পেয়ে গেল। ঠিক সেই সময় হোটেলের দুজন মুটে একটা বড় বাক্স ব'য়ে নিয়ে এল! দুর্গন্ধ এবং তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বাবাজীর বুঝতে বাকি রইল না যে, তারা নিষিদ্ধ মাংস নিয়ে এসেছে। একটা বাড়ির সামনে তারা 'দরওয়ানজী' বলে হাঁক দিতেই ভেতর থেকে কেউ তাদের ভেতরে আস্‌তে বলল। বেলফুল এবং বরফওয়ালা এসেও হাজির হল। এই সময় যন্ত্রীদলসহ নিতম্বিনী ও পয়োধরী

নামে দুজন বারবিলাসিনীও সেখানে এসে উপস্থিত। কালীনাথবাবু নিতম্বিনীকে গতকাল যে ব্র্যাণ্ডি খাইয়েছিল, তাও তাদের কথাবার্তায় জানতে পারা গেল। এইবার বাবাজীর প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে আর বাকি রইল না। এহেন সময় সেখানে নবকুমার ও কালীনাথের একত্রে আবির্ভাব। বাবাজীকে দেখে নবকুমার বুঝতে পারল যে, কর্তা তাদের পিছনে লোক লাগিয়েছে। কালীনাথ তাকে ঘা-দুই দিয়ে বিদায় ক'রে দিতে বলল বটে, কিন্তু চতুর নবকুমার তা না ক'রে তাকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করবার পরামর্শই দিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কক্ষ। রাত নটাও তখন বাজেনি। নবকুমার ও কালীনাথের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য, বলাই, শিবু, মহেশ প্রভৃতি বাবুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় রত। তাদের সেইসব কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, চৈতন্য ও শিবু নবকুমার-কালীনাথের পক্ষে; আর বলাই ও মহেশ বিপক্ষে। নবকুমার-কালীনাথের বিদ্যাবুদ্ধিতে শিবু আস্থাশীল, তাদের ছাড়া যে সভা অচল—সেকথা স্বীকার করতে চৈতন্যেরও দ্বিধা নেই। পক্ষান্তরে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে বলাই আর মহেশ সম্পূর্ণ বিপরীত মতই পোষণ ক'রে থাকে। নব ও কালীকে বাদ দিয়ে সভায় কাজ শুরু করার ব্যাপারে বলাই-ই প্রথম তৎপরতা দেখাল। মহেশ চেয়ারম্যানরূপে চৈতন্যের নাম প্রস্তাব করল। চেয়ারম্যান ব্র্যাণ্ডি, তামাক, বরফ প্রভৃতি আনবার হুকুম দিলেন এবং সেইসঙ্গে বাজনদারসহ নিতম্বিনী-পয়োধরী—এ দুই খেমটাওয়ালীরও ডাক পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই পয়োধরীর গান শুরু হয়ে গেল। এহেন সময়ে নবকুমার-কালীনাথের আবির্ভাব। তারা নিজেদের বিলম্বের কারণস্বরূপ পথে কিছু জরুরী কাজের দোহাই দিল। এরমধ্যে দলে পড়ে শিবুর মতও আশ্চর্যজনকভাবে অনেকটা পাল্টে গেছে। সে-ই "মিথ্যা কথা" বলে আক্রমণ ক'রে বসল নবকুমারকে। নব দারুণভাবে চটে গেল সে-কথায়। চৈতন্য উদ্যোগী হয়ে সব কিছু সম্‌লে নিল। সভাপতিত্বের ভার এবার এল নবকুমারের হাতে। কালীনাথ কিছুটা চিন্তান্বিত—সে ভাবছে বাবাজী একজন বৈষ্ণব হয়েও ঘুষ খেয়ে কি ক'রে মিথ্যা বলতে রাজী হয়ে গেল! তাকে চিন্তামুক্ত করতে এবং সকলকে আনন্দ দিতে নব মদ্যপানের ঢালাও হুকুম দিয়ে পয়োধরীকে নাচবার নির্দেশ দিল। কিন্তু সদস্যদের অনুরোধে নবকুমারকে

প্রথমেই করতে হল সভাপতির ভাষণদান। তাঁর ভাষণে সভার উদ্দেশ্যস্বরূপ ব্যক্ত হল : যদিও তাঁদের সকলেরই জন্ম হিন্দুকুলে, তবুও তাঁরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী নন। প্রকৃত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে তাঁরা সবরকম কুসংস্কার জয় ক'রে সমাজসংস্কারে প্রয়াসী। এজন্যে তাঁদের সকলকে চিন্তাশক্তি ও মনকে একত্রিত ক'রে কাজে নামতে হবে। স্ত্রীশিক্ষা-স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসার, জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধন, বিধবাবিবাহের প্রচলন প্রভৃতি প্রগতিশীল কাজে তাঁরা আত্ম-নিয়োগ করলেই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মতো উন্নত দেশ ও জাতির সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে।

বক্তৃতার পরবর্তী অংশে ঘোষিত হল : এই দেশ বর্তমানে নানা কুসংস্কারের জালে জড়িত থাকায়, তা মস্ত একটা জেলখানার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এই সভা-গৃহ সেসব মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে তাকে 'স্বাধীনতার দালান' বললে অত্যুক্তি হয় না। যায় যা খুশি করার নাম যেহেতু স্বাধীনতা, অতএব এখানে যার যা খুশি সে তা-ই করুক। স্বাধীনতার নামে সকলে স্ফূর্তিতে মেতে উঠুক।

সকলে নবকুমারের এই বক্তৃতাকে স্বাগত জানাল। নবকুমারও বলাইকে ইঙ্গিত করল সকলকে মদ পরিবেষণে আপ্যায়িত করতে। এরপর পয়োধরী ও নিতম্বিনীকে নাচ-গান শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে সবাইকে সে নৈশভোজের টেবিলে নিষিদ্ধ মাংসাদি সহযোগে ভোজনে আহ্বান জানাল। বাজনদাররা ছাড়া সকলেই চলে গেল। তারা বাবুদের উচ্ছিষ্ট মদের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ ক'রে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করল। কেউ কেউ তাতেও তৃপ্ত না হয়ে অভ্যস্ত-নেশা গঞ্জিকার অনুসন্ধান করতে লাগল।

। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমারের শোবার ঘর। সে বাড়ি নেই। সেই সুযোগে তার স্ত্রী হরকামিনী, বোন প্রসন্ন, খুড়তুতো বোন নৃত্যকালী ও কমলা তাসখেলায় মগ্ন। প্রথম দুজন একজোটে এবং পরবর্তী দুজন ভিন্ন জোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতেছিল। এমন সময় গিন্নিমা তাদের তল্লাশ করলেন। তাঁর ডাক প্রসন্নরই প্রথম কানে গেল। সে ভীত সন্ত্রস্তভাবে জানালে যে তারা দাদার বিছানা পাড়ছে। হরকামিনী তাকে তাসজোড়াটা লুকিয়ে ফেলতে বলল—কারণ, "ঠাকরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।" প্রসন্ন বালিশের তলায় তাসজোড়াটা লুকিয়ে ফেলে সকলকে চাদরখানা ধরে ঝাড়বার পরামর্শ দিল। তার ফলে মা এসে

তাদের দেখতে পেলেও, প্রকৃত ঘটনা কিছু বুঝতে পারবে না বলেই তার বিশ্বাস। এবিষয়ে নৃত্যকালী এবং কমলার বিশেষ কোন ভাবান্তর অবশ্য লক্ষ্য করা গেল না। যাই হক, মা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাসখেলার ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও তিনি একালের মেয়েদের অলসতা ও কর্মতৎপরতার অভাবের সমালোচনা করলেন। তাঁর মুখেই কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, নবকুমার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় গেছে। ইতোমধ্যে নিচে ডাক পড়ায় গিন্নিমা নেমে গেলেন। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কার্যকলাপ সবই হরকামিনীর জানা ছিল। কাজেই আর এক দিনের ঘটনার কথা তুলে প্রসন্নর প্রতি পরিহাস-ছলে কটাক্ষপাত করতেই প্রকাশ হয়ে পড়ল: সেদিনও নবকুমার উক্ত সভা থেকে মত্ত অবস্থায় ফিরে এসে বোনের গালে চুমো খেতে চেয়েছিল। বোন এতে আপত্তি করায় সে জানিয়েছিল, সায়েবরা অনুরূপ আচরণই ক'রে থাকে; সুতরাং তার এতে দোষ হল কোথায়? হরকামিনী ও প্রসন্নর মধ্যে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ভাই-বোনের সম্পর্ককেন্দ্রিক আরও কিছু আদিরসাত্মক রসিকতা হল। এই সময় নিচ থেকে কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা ও চীৎকার কানে ভেসে এল। বোঝা গেল মত্ত অবস্থায় নবকুমার সভা থেকে ফিরে এসেছে এবং বৈদ্যনাথ তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। নৃত্যকালী ও কমলা লুকিয়ে তামাশা দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে হরকামিনীকেও সঙ্গে নিতে চাইলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানাল যে, তার 'ওসব ভাল লাগে না'। কর্তা তখন ভাত খেতে বসেছে। ওদিকে হল্লা চরমে। হরকামিনী প্রসন্নকে এগিয়ে গিয়ে তার দাদাকে চুপ করাবার ব্যবস্থা করতে বলল। সে রাজি হল না। অগত্যা হরকামিনী নিজেই গেল। মত্ত নব তাকে পয়োধরীজ্ঞানে অনেক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে যেতে লাগল এবং একসময় টাল সামলাতে না পেরে সে মাটিতে পড়ে গেল।

এই গোলমাল শুনে গিন্নিমা ছুটে এলেন। তিনি প্রথমটায় সঠিকভাবে কিছু যেন বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রসন্নকে বললেন কর্তাকে একবার সেখানে ডেকে আনবার জন্যে। নৃত্যকালী দাদার মুখের দুর্গন্ধের কথা উল্লেখ করল। তাতেও তাঁর কিছু বোধোদয় হল না। তাঁর দুধের বাছাকে কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে বলে বিলাপ করতে লাগলেন। ওদিকে কর্তা বেরিয়ে এলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে দেখেই সব বুঝে নিয়ে নবকে ভর্ৎসনা শুরু করলেন। গিন্নি এতে বাধা দেওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। নব ওদিকে প্রলাপ বকে যেতে

লাগল। গিন্নিমা তাকে ভূতে পেয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কর্তা সুস্পষ্টভাবেই এবার তাঁকে, নব যে মাতাল হয়েছে, সে-কথা জানালেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ মা সে-কথা বুঝতে চান না। নবর বিশৃঙ্খল কথাবার্তায় আর যখন তাকে মাতাল ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে করার উপায় রইল না, একমাত্র তখনই তিনি মন্তব্য করলেন: 'ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা!'

কর্তা কাল সকালেই 'মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী' কলকাতা ছেড়ে সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রার সংকল্প ঘোষণা করলেন। গিন্নিমা প্রসন্ন এবং কমলাকে নবর কাছে আরও কিছুক্ষণ থেকে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

হরকামিনী এবং প্রসন্ন এইবার একান্তে কিছু কথা বলার সুযোগ পেল। তাদের কথায় পাশ্চাত্য-অনুকরণসর্বস্ব আধুনিক শিক্ষা এবং সভ্যতার নামে নবকুমারদের মতো যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে কুলবধূদের যে কী দুর্বিষহ মনোবেদনা নিত্য বহন করতে হয়, তা প্রকাশ পেল। তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং বিষাদঘন মন্তব্যগুলি প্রহসনটির লঘু হাস্যরসাত্মক উজ্জ্বল পটভূমিকায় যেন একরাশ কালো মেঘের সঞ্চার করল। সে কালোয় অবশ্য আলো যে চির-ঢাকা পড়ে গেল তা নয়, বরং মেঘভাঙা রোদের তীক্ষ্ণ দ্যুতি সভ্যতার ঐসব কালা-পাহাড়ী প্রবক্তাদেরই মর্মমূলে তির্যক আঘাত হানল।

সমাজচিত্র

সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। 'একেই কি বলে সভ্যতা' একটি সামাজিক প্রহসন। কাজেই সমাজের সঙ্গে এর যোগ যে অত্যন্ত গভীর, সেকথা সহজেই বোঝা যায়। আর, এই কারণেই সমকালীন সমাজের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি প্রহসনটির প্রেক্ষাপটে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানে তখন আমাদের দেশে আধুনিক ধনবাদীযুগের সূচনা হয়েছে। কিন্তু, এই যুগপরিবর্তন এদেশে যে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে নি, সেকথা "যুগ-পরিচয়" অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এরই ফলস্বরূপ দেখা যায় যুগান্তর সাধিত হলেও, এদেশে পূর্ব যুগের সমস্ত লক্ষণ নিঃশেষ হয়ে গেল না; আবার নতুন যুগের সমস্ত লক্ষণকেও আমাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ হয়ে উঠল না। উভয় যুগের দো-টানায় পড়ে আমাদের চিত্তলোকেও কে-

একটা দোলাচলবৃত্তি জেগে উঠেছিল, তারও সুন্দর একটা পরিচয় এই প্রহসনে মেলে।

পৃথিবীর উন্নত ধনবাদী দেশগুলোতে দেখা যায়, সেখানে যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী-সংঘর্ষ এবং যন্ত্রসভ্যতাকে ভিত্তি ক'রে। ফলে সে-সব দেশে জমির মালিক এবং কৃষিজীবী মানুষেরা রূপান্তরিত হয়েছে যথাক্রমে কলকারখানার বিত্তশালী মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণীতে। সৃষ্টি হয়েছে উন্নত শহর-সভ্যতার। কিন্তু এখানকার চিত্র ভিন্ন। এখানে অর্থকৌলীন্যবশত মুষ্টিমেয় মানুষ ইংরেজি-শিক্ষার সুযোগ লাভ করে ক্রমশ চাকুরিজীবীতে পরিণত হয় এবং তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে থাকে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। পরিপূর্ণভাবে চাকুরিজীবীতে পরিণত হতে এদের অবশ্য সময় লেগেছিল। সেই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে এদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল গ্রামের জমিজমা। কাজেই মধ্যযুগীয় একান্নবর্তী পরিবারগুলো আরও কিছুদিন স্থায়িত্বলাভ করেছিল।

আলোচ্য প্রহসনের নায়ক নবকুমারকেও আমরা একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যরূপেই দেখতে পাই। শহরে তার বাস। চাকরি-বাকরি তাকে করতে হয় না। অথচ, বন্ধুদের স্ফূর্তির জন্যে "মনি ম্যাটারে" তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতেও তার ক্লান্তি নেই। সংসারের যিনি কর্তা, তাঁকেও চাকরি-বাকরি করতে দেখা যায় না। কিন্তু তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রে বেড়াবার মত আর্থিক-সংগতি তাঁর আছে। আবার, দাস-দাসী রেখে রাজার হালে সংসার চালাবার অর্থ যোগাতেও তিনি সমর্থ। জমি-জমাসূত্রে গ্রামীণ আয়ের উৎস না থাকলে এরকম জীবনযাপন সম্ভবপর নয়। এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁদের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এঁদের পাশাপাশি হোটেলের মুটিয়া, গৃহভৃত্য, বাজনদার ইত্যাদিদের 'নিম্নবিত্ত' বা 'শ্রমজীবী' সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করতে হবে। এদের বিভিন্ন সংলাপে নিজেদের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবনের দীর্ঘ-শ্বাসটুকুও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এরা সুসংগঠিত নয়, শিক্ষার আলোকও পায়নি। কাজেই এরা নিজেদের এই দুর্দশার প্রকৃত কারণটুকু জানে না। তাই কেউ মনে করে "এই হিঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে"; আবার কেউ বাবুদের উচ্ছিষ্ট মদে কিংবা "এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা"য় বুঁদ হয়ে অবক্ষয়ের যন্ত্রণাটুকু ভোলবার সহজ পথ খোঁজে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এদেশের

নবীন যুবকদের মধ্যে একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। তারা জ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, চিরাচরিত প্রথার অবসান ঘটাতে চায়। কারণ তারা মনে করে এসব না হলে কুসংস্কারের বোঝা দূর করা যাবে না; আর কুসংস্কার দূর না হলে সমাজসংস্কারও অসম্ভব। নারীশিক্ষার প্রবর্তন, স্ত্রীস্বাধীনতা আনয়ন, বিধবাবিবাহের প্রচলন, জাতিভেদ দূরীকরণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা সমাজসংস্কারেও প্রয়াসী।

কিন্তু এই সব মহৎ ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপদান করতে গেলে যে অটুট মনোবল ও চরিত্রবলের প্রয়োজন, তাদের অধিকাংশেরই তা নেই। আর তাই এসব সদিচ্ছা তাদের কাছে হয় হুজুগের সামগ্রীতে, নয় কথার কথাতে অনায়াসেই পরিণত হয়ে যায়। কথায় ও কাজে সৃষ্টি হয় দুস্তর ব্যবধান। ফলে যে নৈতিক অবক্ষয়ের ধারা সম্মুখীন হয় তাতে তাদের ঐসব বড় বড় বাগাড়ম্বরের আড়ালে মদ্যপান বারাঙ্গনাসেবা ইত্যাদি কুৎসিত আচরণ করতে বাধে না। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নবকুমারের বক্তৃতা এবং সদস্যদের আচার-আচরণকে লক্ষ্য করলেই এ-সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কর্তামশায়ের ধর্মীয় নিষ্ঠা, গিন্নিমায়ের রক্ষণশীলতা ইত্যাদি একদিকে রয়েছে; অপর দিকে আছে নবকুমার কালীনাথ ইত্যাদিদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। তারা পুরোনো যা-কিছু তাকেই নির্বিচারে আক্রমণ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। তাদের কাছে হিন্দুধর্মটাই যেন রক্ষণশীলতার প্রতীক। প্রসঙ্গত আমাদের ডিরোজিও-শিষ্যদের পরিচালিত "Athenium" পত্রিকায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে জনৈক ছাত্রের লেখা "If there is any thing that we hate from that bottom of our heart, it is Hinduism."—উক্তিটির কথা মনে পড়ে যাবে। তাই তারা বাবুর্চির হাতের রান্না নিষিদ্ধ মাংস খেতে এত উৎসুক। নিজেদের ধর্মগ্রন্থের নামটুকু মনে রাখাও তারা অনাবশ্যক মনে করে। তাই হঠাৎ যখন সেসবের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তারা ঠিকমত তা না পারে স্মরণ করতে, না পারে উচ্চারণ করতে। কর্তার কাছে কালীনাথ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও 'গীতগোবিন্দে'র নামটুকু উল্লেখ করতে গিয়ে কেমন বিপাকে পড়েছিল, তা আমাদের জানা আছে।

নবীন-প্রবীণদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘর্ষজাত এই মানসিক অস্থিরতার হাত থেকে পরবর্তী কালে অবশ্য তাদের অনেকখানি রক্ষা করে ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দু'বছর পর তাঁর ইংলণ্ড

-গমনের পর এটি দুর্বল হয়ে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে এর পুনরুত্থান ঘটলেও, ১৮৬০-৭০ খ্রীস্টাব্দই এর গৌরবময় যুগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ প্রহসনটি রচনার সমকালে, ব্রাহ্মসমাজের আবার অভ্যুত্থান ঘটছে। তাই প্রহসনটির শেষাংশে দেখা যায়, প্রসন্ন দাদা কোথায় গেছে জানতে চাওয়ায় গিন্নিমা তাকে "ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে" বলে জানিয়েছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান ঘটলেও যুবমানসে তার প্রতিষ্ঠালাভে আরো কিছু সময় লেগেছিল। কাজেই সংযমের সাধনার মধ্যে চরিত্রবল এবং মনোবল আহরণ নয়, বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে দিয়ে তারা মুশকিল আসানের সহজ রাস্তা খোঁজে। সাগর পারের সমাজ আর আমাদের সমাজের রীতিনীতির দুস্তর পার্থক্যের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাই তারা বোনের গালেই চুমো খেতে চায়, আর বাঈনাচকে "বল নাচ" বলে উল্লেখ করে। নবকুমারের আচরণ এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যাবে। ভাই-বোনের সম্পর্কগত উক্ত দৃষ্টান্তের কথা তুলে কেউ কেউ মধুসূদনের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল।......সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্মাধর্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই......ইত্যাদি ইত্যাদি।" হতে পারে এ রটনামাত্র। কিন্তু কোনো রটনা কি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন হতে পারে?—মনে প্রশ্ন জাগে।

যাই হক, অনুকরণে এরা এতই অন্ধ হয়ে উঠেছিল যে, আর্শিতে নিজমুখটুকু দেখবার অবকাশও যেন এদের হত না! তাই কথায় ও কাজে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে হিপোক্র্যাসির চূড়ান্ত করে ছাড়লেও, বৈষ্ণব-বাবাজীর কাজে এই ধরনের অসংগতি দেখা দেওয়া মাত্রেই তাকে এদের 'শালা' কি 'হিপক্রীট' বলে গাল দিতে বাধে না। কথায়-বার্তায় এরা এত বিদেশী ও দেশী গালিগালাজের প্রয়োগ করে যে এদের রুচিবান্ শিক্ষিত বলতে আমাদের সংকোচ হয়। এদের জেহাদ শুধু নিজের ধর্মের বিরুদ্ধেই নয়, মাতৃভাষাকে নেটিভের ভাষা মনে করে এরা নিশ্চয় তাকে অবজ্ঞাও করে। তাই তাদের ভাষায় 'ওল্ড ফুল', 'মরাল করেজ', 'সুপরষ্টিসন' ইত্যাদি বিদেশী কথার এত ছড়াছড়ি! বাঙলা বাক্যের গঠনও অধিকাংশ সময় ইংরেজি ঢঙে করা হয়ে থাকে। বিশেষ ক'রে কালী-

নাথের বাক্য এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। এর মধ্যেও আদৌ কোনো অতিরঞ্জন নেই। 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু এদের এই ধরনের বাক্যপ্রয়োগের সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যেমন: "আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctorকে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন"...ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সেকালে, কর্তাদের মতো, সনাতনপন্থী-দের ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যেত; আর ইংরেজি-অনভিজ্ঞ এদেশীয়দের সঙ্গে বাক্যালাপে বিদেশীরা যে যথাসম্ভব ভাঙা হিন্দি বা বিকৃত বাঙ্‌লা শব্দ ব্যবহার করত, তার পরিচয় সার্জেণ্টের সংলাপে পাওয়া যায়।

'ইয়ং বেঙ্গল' শ্রেণীর কালাপাহাড়ী মনোভাবের সংগে সংঘাতে সে-সময় আমাদের সনাতন জীবনধারার অন্তর্ভুক্ত বন্ধুত্ব, কর্তব্যবোধ, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কর্মনৈপুণ্য, শ্রমশীলতা ইত্যাদি মানবিক সদ্‌গুণাবলীর অবসান ঘটতে থাকে—অথচ, নতুন মূল্যবোধের আবির্ভাব তখনও হয়নি। তাই দেখা যায় নবকুমারের অনুপস্থিতিতে তার বন্ধুরা তারই নিন্দায় পঞ্চমুখ—অথচ এত স্ফূর্তির ফোয়ারা কার দৌলতে ছুটছে, তা তারা একবারও ভেবে দেখছে না। নব-কুমার কালীনাথের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বাবাকে প্রতারণা করছে; কিংবা এক জায়গায় বলছে: "ড্যাম কত্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে?"—অথচ এসব করতে বা বলতে তার এতটুকুও সংকোচ হচ্ছে না। গিন্নিমার কথায় বোঝা যাচ্ছে তাসখেলা আর গল্পগুজবে মত্ত হয়ে কলিকালের মেয়েরা কেমন "কুড়ের সদ্দার" হয়ে পড়েছে বা তাদের কর্মকুশলতা নষ্ট হয়েছে। এসবের মধ্যে দিয়ে দাস-দাসী সমন্বিত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অন্তঃপুরের ছবিটিও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

সেই ভাঙন-ধরা সমাজে রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পুলিস-প্রহরীরা নিরীহ মানুষকে ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে—যা তাদের অযোগ্যতারও পরিচায়ক। এদেরই শিকার হয়েছে বৈষ্ণব বাবাজী। অবশ্য সে-ও ধোয়া তুলসীপাতা নয়, বরং জলজ্যান্ত একটি তুলসীবনের বাঘ! বাইরে মালাজপ করলেও বারাঙ্গনাদের দিকে লোলুপ নয়নে তাকাতে তার বাধা নেই। আবার নবকুমার উৎকোচের লোভ দেখালে অতি সহজেই সে তার বশীভূত হয়ে মিথ্যাচারে স্বীকৃত হয়েছে। কর্তার মতো স্বধর্মনিষ্ঠ আদর্শ বৈষ্ণবের পাশাপাশি এইরকম ভণ্ড, ভেকধারী, অনাচারী বৈষ্ণবেরও সে-সমাজে অভাব ছিলনা।

ভাঙন-ধরা সমাজে দূষিত ক্ষতের মতোই সৃষ্ট হয় বারাঙ্গনা-পল্লী। এখানেও

আমরা বেলফুল আর বরফ-কেরির মধ্যে দিয়ে তা যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

সমাজের এই সামগ্রিক অবক্ষয় মধ্যে বাঙলার ঘরে ঘরে যে-সব স্নেহান্ধ আশঙ্কাতুরা জননীদের দেখা যায়, দুর্ভাগাহতা জায়ারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—এখানে গিন্নিমা এবং হরকামিনী যথাক্রমে যেন তাঁদেরই প্রতিনিধি। "তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না"—প্রসন্নর প্রতি হরকামিনীর সমবেদনাসূচক এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সেই সমাজে অনেক নারীকেই স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে অভিশপ্ত জীবনের গ্লানিকে বহন করে চলতে হত। এর পাশাপাশি আবার ঝগড়া, পরচর্চা, তামাশা দেখা, সামান্য আদিরসাত্মক রসিকতা সহযোগে যে নারীসমাজ মূর্ত হয়ে ওঠে—তাও সেই সমাজেরই একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্ত্রীশিক্ষার তখন বিশেষ প্রসার না হওয়ায় ঝগড়া, পরচর্চা, তাসখেলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই তাই সাধারণত তাদের দিন কাটাতে হত।

আলোচ্য প্রহসনের পরিধি সীমিত। সমাজের এই এতগুলি দিককে চিত্রিত করবার তাগিদ কোনো প্রহসনকারেরই থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও মধুসূদন দক্ষ শিল্পীর তুলির সামান্য আঁচড়ের মতো এসব যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আমাদেয় শুধু বিস্ময়েরই উদ্রেক করে না, তাঁর উচ্চস্তরের শিল্পপ্রতিভারও সাক্ষ্য দেয়।

চরিত্রবিচার

(ক) প্রধান চরিত্র : নবকুমার

'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন : "'একেই কি বলে সভ্যতা'র নায়ক নববাবু একটা শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। এমনকি, নববাবু যে কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইংরাজি-পড়া নূতন নববাবুর দল বা ইয়ং বেঙ্গল, তাহা তৎকালীন লোকেরাও বুঝিয়াছিলেন।" প্রবীণ সমালোচকের এই মত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে আলোচ্য চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে তার শ্রেণীচরিত্রের লক্ষণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নেই, তাকে অতিক্রম ক'রে তার ব্যক্তি-লক্ষণও অনেকাংশে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এই প্রহসনে নবকুমার চরিত্রটি তাই সব দিক দিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে এবং এটি অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি পূর্ণতাও লাভ করেছে। অন্য যে-

কোন চরিত্র এখানে হয় বৈপরীত্যের সৃষ্টি ক'রে, না হয় একটা তুলনার ভাব জাগিয়ে তুলে, আলোচ্য চরিত্রেরই নানা দোষ-গুণ, নানা অসংগতিকে পরিস্ফুট করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রহসনের প্রত্যেক অঙ্কের প্রত্যেক দৃশ্যেই নবকুমারকে দেখা যায়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে তার উপস্থিতি তুলনামূলক-ভাবে কিছুটা কম হলেও, তার প্রাধান্য একটুকুও কমেনি। কারণ, কর্তাকর্তৃক প্রেরিত হয়ে এখানে বাবাজী এসেছে তারই গতিবিধি লক্ষ্য করতে। অবশেষে এই দৃশ্যের শেষভাগে কালীকে সঙ্গে নিয়ে নবকুমার আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ঘুষের প্রলোভন দেখিয়ে বাবাজীকে বশ ক'রে ফেলেছে। ফলে, বাবাজীকে এর আগে মাতাল-সন্দেহে বারাঙ্গনাদের গালি হজম করতে হয়েছে, পুলিসী হাঙ্গামার তিক্ত অভিজ্ঞতা হজম করতে হয়েছে—এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে সংযোগসূত্র আবার স্থাপিত হয়েছে নবকুমারকে কেন্দ্র করেই :

প্রথম থেকেই নবকুমার নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। তার চরিত্রে বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। শুরুতেই দেখি সে ধীরভাবে ভাবতে পারে, আবার হঠাৎ বিপদে পড়লে কেমন ক'রে জাল কেটে সুকৌশলে বেরিয়ে আসতে হয়, তাও তার অজানা নেই। বৃন্দাবন থেকে কর্তা ফিরে এসেছেন, ছেলের চাল-চলনের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি—এই অবস্থায় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় গিয়ে স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসানো মুশকিল ! তবুও কৌশল উদ্ভাবন করতে তার খুব একটা দেরি হল না। দৃষ্টিভঙ্গী তার খুবই প্রখর। কোন্ মানুষের কোথায় দুর্বলতা, তা সে একদৃষ্টিতেই বুঝে নিতে পারে। তাই সে অনায়াসেই বন্ধু কালীনাথকে বৈষ্ণব-সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'কে সংস্কৃত-জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান বলে জানিয়ে, সেখানে যাবার অনুমতি সহজেই আদায় ক'রে নিল। পরেও দেখেছি, নিষিদ্ধ পল্লীতে যখন সে বাবাজীর হাতে ধরা পড়ে গেল, একদৃষ্টিতে মানুষ চেনার এই সূক্ষ্ম ক্ষমতাবলেই সে বুঝে নিল উৎকোচের টোপ এই লোভী বৈষ্ণবটি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। এই পথেই সে-যাত্রায় তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও নবকুমার কত সচেতন, ভাবলে অবাক হতে হয়। বাড়িতে মদ খাবার পর কালীকে জোরে কথাবার্তা বলতে সে নিষেধ করেছে পান খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করবার পরামর্শ দিয়েছে। কর্তাকে মনে মনে সে যে কিছুটা ভয় করে, অন্তত অপরিণামদর্শীর মতো সহসা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সে যে

লিপ্ত হতে চায় না—এসব ঘটনা তারই প্রমাণ। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সে কর্তা সম্পর্কে যে-সব কটু কথা উচ্চারণ করেছে, তা অবশ্য সম্পূর্ণই মত্ত অবস্থায় এবং তার গোপন আচার-আচরণ ঘটনাচক্রে যখন কর্তার কাছে ফাঁস হয়েই গেছে, একমাত্র তখনই। তার চরিত্রের আর একটা দিক তার আত্মসংযত এবং বুদ্ধিপ্রখর আচরণ। এই দিকগুলি অবশ্য তার বন্ধু কালীনাথের বেসামাল আচরণের পাশাপাশি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই চরিত্রের কিন্তু আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল বিদ্যাবুদ্ধি, স্মরণশক্তি এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তথা ব্যক্তিত্ব। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় তার ভাষণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি তার ইংরেজি বিদ্যা, পর্যবেক্ষণী শক্তি, কার্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞান এবং সমাজ-সচেতনতার পরিচয়। সে জানে আমাদের সমাজে জাতিভেদপ্রথা, নারীজাতির প্রতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের কতখানি দুর্বল ক'রে রেখেছে। সে বুঝেছে এর মূলে অটল হয়ে বসে রয়েছে কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর। সেই পাথরকে না সরাতে পারলে আমাদের মুক্তি নেই এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যুক্তিবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সেই অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হবে। তাই দেখি বন্ধু মহেশ তার অনুপস্থিতিতে তার বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে যে মন্তব্যই করুক না কেন, সে যখন উপস্থিত হল, তার নেতৃত্বকে কার্যত অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারো রইল না। সে ভিন্ন ভাবাদর্শে বিশ্বাসী, তবুও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'—নাম দুটি তার নিখুঁতভাবেই মনে আছে। তাই কালীনাথ গ্রন্থদুটির নাম উল্টোপাল্টা উচ্চারণ করার পরে একসময় নবকুমার তার 'মেমারি' নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। এতগুলি গুণে প্রহসনকার গুণান্বিত করেছেন নবকুমারকে। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গুণগুলি আভাসে-ইঙ্গিতেই ব্যক্ত হয়েছে, সুস্পষ্ট কোনো রূপ লাভ করেনি।

এর অবশ্য একটা কারণও আছে। গুণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেই তা বেশি-মাত্রায় পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মতো ট্র্যাজিক-চরিত্রে পরিণত হবার উপক্রম হত—প্রহসনের চরিত্র হয়ে উঠত না। কাজেই প্রহসনকার সে-চেষ্টা না ক'রে, তার চলন-বলন-মননের ভিতর নানা অসংগতির বীজকে প্রদর্শন ক'রে, তার চারিত্রিক বিকৃতিকে ফুটিয়ে তুলে আপন উদ্দেশ্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচ-ছয় ঘন্টার মধ্যে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনায় তাই কোন চারিত্রিক বিকাশ দেখানো লেখকের লক্ষ্য ছিল না, তার মেজাজ ও মর্জির ঘন ঘন পরিবর্তনটাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

দোষে-গুণেই মানুষের চরিত্র সজীব হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়। নবকুমারের চরিত্রেও অনেক গুণের আভাস আমরা ইতঃপূর্বে দেখলাম। কিন্তু তার চরিত্রে কতকগুলো মারাত্মক দোষেরও অভাব নেই। প্রহসনের প্রথমেই দেখা যায় পিতার কাছে বন্ধু কালীনাথের মিথ্যে পরিচয় দান করার ব্যাপারে তাকে প্ররোচনা যোগাতে তার বাধেনি। এ-ঘটনায় তার প্রতারক মনোভাবের এবং পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় তার কথায় ও আচরণে স্বধর্মে আস্থাহীনতা, মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ এবং বারাঙ্গনা-সেবার পরিচিতি মেলে। বাবাজী উৎকোচ গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তাকে সে আপন স্বার্থেই প্রলুব্ধ ক'রে উৎকোচ-প্রদান করেছে—এ দায়িত্বও সে এড়িয়ে যেতে পারে না। বক্তৃতায় যার সমাজ-সংস্কারের কথার ছড়াছড়ি, নিজেই সে এহেন সমাজবিরোধী আচরণ ক'রে বসে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়েও আর এক কুসংস্কারের ফাঁদে এসে পড়েছে! তার ধারণা যেন হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও নানা সংকীর্ণ মানসিকতার গণ্ডি থেকে উদ্ধার পেতে গেলে কোন চারিত্রিক-মানসিক দৃঢ়তা অর্জনের প্রয়োজন নেই, কোন সাধনার দরকার নেই—স্রেফ্ মদ্য, নিষিদ্ধ মাংস আর বারাঙ্গনাবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই চলবে।

এই কুসংস্কারেরই আর এক পরিণাম অন্ধ বিলেতিয়ানা। এর প্রভাবেই সে খেমটা নাচকে 'বল্ নাচ' বলে অভিহিত ক'রে বলে : "কম্, ওপেন দি বল, মাই বিউটিস্।" বারাঙ্গনাকে আহ্বান জানায় সম্পূর্ণ বিলেতি রীতিতে—"ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও।" এসবের রেশ বাড়িতে এসেও মেলায় না। বোনের গালে সে চুমো খেতে চায়। বোন আপত্তি করলেই যুক্তি দেখায়, "সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?" আসলে দুই দেশের সামাজিক রীতিনীতিতে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, তা সে সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়ে গেছে ঐ বিলেতিয়ানাকে যান্ত্রিকভাবে অনুকরণ করতে গিয়েই। অথচ মুখের কথায় (যেমন, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় বক্তৃতাদানকালে) সে "বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী" হওয়ার কথা অনায়াসেই বলে। এখানে 'বিদ্যাবল' বলতে সে নিশ্চয়ই যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বুঝিয়েছে। উক্ত উক্তির "ফ্রী" হওয়া কথাটিও লক্ষ্য করবার মতো। শব্দটির প্রকৃত অর্থ মানসিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ। কিন্তু নবকুমারের আরোপিত তাৎপর্য যে কত মারাত্মক, তা তার পরবর্তী উক্তিতেই ধরা

পড়েছে : "জেন্টেলমোন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্।" "ফ্রীডমে"র এই নতুন তাৎপর্য তার কথাতেই শুধু আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। পরক্ষণেই সে সুরা ও সাকীর কদর্য স্রোতে মত্ত হয়ে প্রমাণ করেছে শব্দটির ব্যবহারিক তাৎপর্য তার দৃষ্টিতে কি হওয়া উচিত। প্রহসনের শেষ দৃশ্যে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে নবকুমার যখন নানা উৎপাত শুরু করল, তখন তার স্ত্রী হরকামিনী প্রসন্নর কাছে একান্তে বলেছিল : "হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। ...তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি।" আর নবর বাড়ি ফেরবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই সে আর একবার প্রসন্নকে পরিহাস-ছলে বলেছিল : "ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না।" হরকামিনীর এই উক্তি দুটো একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর ঘরেই যেন একটা বন্দিনীর জীবন যাপন করছিল, তাই সে হয় বাপের বাড়ি গিয়ে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছে। আর প্রসন্নকে ঐ স্থূল আদিরসাত্মক মন্তব্য করা এবং তার বিকৃত উচ্চারণভঙ্গীই প্রমাণ করেছে সে যথেষ্ট শিক্ষিতা নয়। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবকুমারের বক্তৃতার "তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর---তাদের স্বাধীনতা দেও" কথাগুলো রীতিমত বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। কারণ, ঐ নারীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার আলোক থেকে তার নিজের ঘরই বঞ্চিত থেকে গেছে—যদিও সভাপতির বক্তৃতায় অবাধে সে ঐসব কথারই ফোয়ারা ছুটিয়েছে!

নবকুমার চরিত্রটির নানাদিক সম্পর্কে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই চরিত্রটি দোষে-গুণে একটা সজীব চরিত্র বটে, কিন্তু তার কথায় ও কাজে, চলায় ও বলায়, ভাবনায় ও ভাবে অসংখ্য অসংগতি রয়েছে। আর এইসব অসংগতি প্রহসনকার স্বেচ্ছায় রূপায়িত করেছেন। কারণ তিনি পূর্ণাঙ্গ কোন সামাজিক নাটক রচনা করতে বসেননি—সৃষ্টি করতে চেয়েছেন প্রহসন, এইসব অসংগতিকে প্রদর্শন ক'রে হাস্যরসের অবতারণা করাই যার মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য তিনি অব্যর্থভাবে ভেদ করতেও পেরেছেন। আর, সেই সাফল্য তাঁর উন্নত প্রতিভারও পরিচায়ক।

(খ) অপ্রধান চরিত্র :

কালীনাথ—

'শ্রেণীবিচার' অংশের ২২-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চৈতন্য, শিবু, বলাই এবং মহেশ—

'শ্রেণীবিচার' অংশের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কর্তা—

নবকুমারের পিতা তথা গৃহকর্তা। পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ভাবালুতার অতিরেক এই চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কালীনাথ পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিলে তিনি সহজেই ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে বলেন : "তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র; যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।" জয়দেবের গীতগোবিন্দের নামটুকু শোনামাত্রই তাঁর ঐ ভাববিহ্বলতা চরমে গিয়ে পৌঁছায় : "জয়দেব? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।" তাঁর এই ভক্তিপ্রাণতা তাঁর সংলাপকেও তৎসম শব্দবহুল এবং সমাসবদ্ধ ক'রে তোলে। সংসারে তিনি বিশেষ থাকেন না—তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণেই তাঁর আসক্তি। কিন্তু তাই বলে সংসার সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন তিনি নন। যতক্ষণ তিনি বাড়ি থাকেন, সব দিকেই তাঁর কড়া নজর। বাড়ির সকলে, এমনকি স্বয়ং নবকুমারও, তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে। তাই পারিবারিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় নবকুমারের চালচলন সম্পর্কিত বহু খবরই তাঁর অগোচরে রাখা হয়। তবুও নবকুমার-কালীনাথের 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় গমন, তাদের নিপুণ অভিনয় সত্ত্বেও, তাঁর মনে সন্দেহ জাগায়। ফলে বাবাজীকে তিনি তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে পাঠান। প্রহসনের শেষাংশে নবকুমার যখন মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এল, তখন গিন্নি পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধতাবশত তাঁকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করবার উপক্রম করলেও, তিনি এক দৃষ্টিতেই নবর প্রকৃত রোগ নির্ণয় ক'রে ফেলেছিলেন। সপরিবারে পরদিনেই মহাপাপ নগর কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্তও তাঁর পারিবারিক কর্তব্যবোধেরই পরিচায়ক।

বাবাজী—

এই বৈষ্ণব চরিত্রটি সবসময় মালাজপে রত এবং মুখে সর্বদা 'রাধেকৃষ্ণ'। কর্তার অনুচর সে—তিনিই তাকে নিযুক্ত করেছেন নবকুমারের গতিবিধি লক্ষ্য

করবার জন্যে। সারা প্রহসনটির মধ্যে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই একমাত্র তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য পূর্ববর্তী গর্ভাঙ্কের শেষাংশে কর্তার মুখে একবার এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমাংশে কালীনাথের মুখে একবার তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে মাত্র। সিকদার পাড়া স্ট্রীটে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র খোঁজে এসে যথাক্রমে বারাঙ্গনা, মাতাল, 'থাকি' ও 'বামা' নামে দুজন বারবিলাসিনী, সারজেন্ট-চৌকিদার, হোটেলের মুটিয়াদ্বয়, বেলফুল-বরফওয়ালা, দরওয়ানজী, বাজনদারসহ নিতম্বিনী-পয়োধরী ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্রের সংযোগে আসায় বাবাজীরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হতে থাকে। প্রহসনে এসব অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকরলেও, মূল ঘটনাধারার সঙ্গে এর সংযোগ বড়োই ক্ষীণ। যাই হক, লোকচক্ষে বৈষ্ণব হলেও খোয়া তুলসীপাতাটি সে নয়—বরং তার প্রকৃত পরিচয় 'তুলসীবনের বাঘ।' বারবিলাসিনীদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে তার বাধে না। আবার নবকুমারের কাছে ঘুষ খেয়ে কর্তার কাছে মিথ্যা বলতেও সে প্রস্তুত! অবশ্য সারজেন্টকে চারটাকা দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ঘটনায় তার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় মেলে। সিকদার পাড়া স্ট্রীটে এসে দুর্ভোগের জন্যে সে যদিও "এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল" বলে নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করে, সঙ্গে সঙ্গে কর্তার বিরুদ্ধে তার ক্ষোভও প্রকাশ পায়। কিন্তু "যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবে"—এ চিন্তাও তার আছে। তার উভয় সংকটের ভাবটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন প্রহসনকার।

সারজেন্ট—

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কিছুক্ষণের জন্যে উপস্থিত হয়েই চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেশের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে গ্রহণ না-করা পর্যন্ত বিদেশী রাজকর্মচারীরা ন্যায়-নীতি পদদলিত ক'রে শাসনের নামে এদেশীয়-দের ওপর কিরকম অত্যাচার চালাত, আলোচ্য চরিত্রে তার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। এই বিদেশী সারজেন্টের ভাষা স্বভাবতই ইংরেজি, কিন্তু ইংরেজি অনভিজ্ঞ মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার সময় সে ভাঙা হিন্দি এবং বিকৃত বাঙ্‌লা শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত। তার সংলাপে একদিকে যেমন রূঢ় ঔদ্ধত্য এবং বিচারবোধহীন দম্ভ প্রকাশ পায়, অন্যদিকে "ব্লাডী নিগর্", "ব্ল্যাক্‌ব্রুট্" কিংবা "দুটি ভেজল্" শব্দপ্রয়োগে ভারতীয়দের প্রতি তার তীব্র ঘৃণাও

প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বাবাজীর জপমালা কেড়ে নিয়ে গলায় পরে "হাম কণ্ঠা হিন্দু হুয়া" বলে হিন্দুধর্মের প্রতি কটাক্ষপাতে তার কৌতুক-প্রিয়তার যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি এদেশীয়দের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটিও ফুটে ওঠে। কিন্তু, এই চরিত্রের আর এক দিক, তার নির্লজ্জ লোভ এবং চরম নীতিবোধ-হীনতা। চুরির মিথ্যাদায়ে বাবাজীকে ধরার তার আসল উদ্দেশ্য, কিছু আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা করা। সেই চেষ্টা যাই সফল হল, অর্থাৎ নগদ চারটি টাকা মিলে গেল, সে অনায়াসেই মন্তব্য করল: "ওয়েল্ দেন্, হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় দেও।"

বৈদ্যনাথ—

কর্তার গৃহভৃত্য। 'বোদে' বলেই তাকে ডাকা হয়ে থাকে। প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে একবার এবং দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে একবার তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কর্তার সে আজ্ঞাবহ হলেও, নবকুমারেরও সে বিশেষ অনুগত। তাকে এবং তার বন্ধু কালীনাথকে সে মদ বার ক'রে দেয়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করবার জন্যে পান এনে দেয়। মত্ত অবস্থায় নব বাড়ি ফিরলে সে তাকে ধীরে ধীরে ঘরে এনে বসায়। নবর অসংলগ্ন কথাবার্তায় সে সায় দেয়, তাকে শান্ত করবারই জন্যে। আবার কর্তাকেও তার ভয়ের অন্ত নেই। পাছে তিনি সবকিছু টের পেয়ে অনর্থ বাধান—এই ভয়ে তাঁর কাছে সত্যগোপনে সে সদাসচেতন। কর্তা খেতে বসেছেন কিংবা বাইরে আসছেন, এসব সংবাদ প্রায় প্রতি মুহূর্তেই সে সরবরাহ ক'রে নবকে সতর্ক ক'রে দেয়। চরিত্রটিতে অবশ্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

মুটিয়াদ্বয়—

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই একবারমাত্র এদের কথোপকথনে রত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই কথোপকথনে এদের সামান্য কিছু চরিত্র-লক্ষণও প্রকাশ পায়। প্রথম জনের নাম জানা যায় না। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গীটি খুবই পরিষ্কার। সে জানে যাদের স্ফূর্তির উপকরণ তারা বহন ক'রে আনছে, তারা প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থেই আস্বাশীল নয়—ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনকেই তারা জীবনের সার বলে বুঝে নিয়েছে। বাস্তববুদ্ধিও তার আছে। সে জানে কাহোকে না ডাকলে মাথায় বোঝা নিয়ে "সারারাত এহানে দাঁড়য়ে থাকি"

হবে। কাজেই সে নিজে উদ্যোগী হয়েই দরওয়ানজীকে ডাকে এবং ভিতরে চলে যাবার অনুমতি পায়। দ্বিতীয় জনের নাম কাদের মিঞা। বাস্তববুদ্ধিতে সে আরো এককাঠি সরেস। সে কাদের দৌলতে যে তাদের "পোঁচবর এত কেপে ওট্‌ছেচে" সেকথা পরিষ্কারভাবেই জানে। তার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য প্রথম জনের মতো অতখানি স্বচ্ছ নয়। কাজেই তার মতে "এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্নেলে।" কিন্তু ওরা যে "না মানে আল্লা, না মানে দেবতা"—এই সত্য ধরা পড়ে গেছে প্রথম জনের দৃষ্টিতেই। এদের সংলাপে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণভঙ্গী খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গৃহিণী—

ইনি নবকুমারের মা। একমাত্র দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই এঁর উপস্থিতি ঘটেছে এবং সেই স্বল্পকালীন উপস্থিতিতেই এঁর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি ফুটে উঠেছে। পুত্রবধূ, কন্যা প্রভৃতিদের সঙ্গে কথোপকথনকালে এঁর চরিত্রের একটি রূপ, আর মত্ত নবকে কেন্দ্র ক'রে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় তাঁর ভিন্ন আর একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রটিতে আমরা তাঁর রক্ষণশীল গৃহকর্ত্রীসুলভ মানসিকতার পরিচয় পাই। এই রক্ষণশীলতা রয়েছে তাঁর জীবনদৃষ্টিতে। নবীনাদের 'কলিকালের মেয়ে', 'কুঁড়ের সদ্দার' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাদের আলস্য এবং কর্তব্যবোধহীনতার তিনি সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে আমরা তাঁর মধ্যে সদা আশংকাতুর অবুঝ মাতৃমনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এইসূত্রে তিনি যেন বঙ্গজননীদের শাশ্বত প্রতিনিধি। মদ-মত্ত পুত্রকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমে তিনি "আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে" বলে বিলাপ করতে লাগলেন। নৃত্য দাদার মুখের বদ্ গন্ধের কথা উল্লেখ করলেও তিনি কিছু যেন বুঝতে পারলেন না, কেবল সন্দেহ প্রকাশ করলেন পুত্রকে কেউ বিষ খাইয়ে দিয়েছে কিনা বলে। কর্তা ইতোমধ্যে উপস্থিত হয়ে এক দৃষ্টিতেই প্রকৃত ঘটনা সব বুঝে নিয়ে পুত্রকে যখন ভৎর্সনা করতে লাগলেন, তখন তিনি নিজেই "বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি" বলে গিন্নির কাছে ভৎর্সিত হলেন। নবর প্রলাপ শুনেও মায়ের চৈতন্য হল না! ছেলেকে ভূতে পেয়েছে বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। প্রলাপের ঘোর "ড্যাম লজ্জা, মদ ন্যাও" কথাগুলির মধ্যে আরও একটু চড়ামাত্রায় প্রকাশ পেলেও তিনি নির্বিবাদে বললেন: "আমার এ দুধের বাছাকে এ সব, কে শেখালে গা!" ঘটনা আরো

সুর পড়ালে, যখন আর কিছু অস্বীকার করবার উপায় রইল না, তখনও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভাণ ক'রে বললেন : "ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা ?" কিন্তু এখানেও শেষ হল না। নব সম্পর্কে "বানরটা একটু দুমুক" মন্তব্য ক'রে কর্তা যখন ভেতরে চলে গেলেন, গিন্নি তখনও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। প্রসন্ন, কমলাকে সেখানে আরো কিছুক্ষণ থাকার নির্দেশ দিয়ে তবে তিনি সেখান থেকে গেলেন। অন্যান্য নারীচরিত্রের মতো এঁর কণ্ঠেও নারীসুলভ বাচনভঙ্গিমা সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে।

হরকামিনী—

প্রহসনের শেষ গর্ভাঙ্কেই এর দেখা মেলে। নবকুমারের স্ত্রী হলেও এর মধ্যে আধুনিকাদের বিশেষ কোন লক্ষণই পরিস্ফুট নয়। অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূরূপেই একে আমরা দেখতে পাই। গৃহকর্মনৈপুণ্যের কোন পরিচয়ও এদের কারোরই নেই। তাসখেলায়, পরচর্চায় কিংবা আদিরসাত্মক রসিকতার মধ্যে দিয়ে কালযাপনেই যেন এরা অভ্যস্ত। এদের সেই ত্রুটি তাই পুরানো ধারার মানুষ গৃহকর্ত্রীর সহজে নজরে পড়ে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী সম্পর্কে ভীতিমূলক মনোভাবটিই তার গৃহবধূসুলভ রূপটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। বিছানা পাড়ার অজুহাত দেখানো হলেও, পাছে শাশুড়ী এসে তাদের তাসখেলায় রত থাকার ব্যাপারটা জানতে পেরে যান, এই ভয়ে প্রসন্নকে সে-ই তাসজোড়াটা লুকিয়ে ফেলতে বলে। মত্ত অবস্থায় নব বাড়ি ফিরে যখন হল্লা জুড়ে দিল, তখন শ্বশুরমশাই ভাত খেতে বসেছেন বলে তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। প্রসন্নকে সে-ই পাঠাতে চায় তাকে থামাবার জন্যে। প্রসন্ন রাজী না হলে অগত্যা সে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করে। এগুলির মধ্যে তার হুঁশিয়ারী মনোবৃত্তিরও আমরা পরিচয় পাই। আদিরসাত্মক রসিকতার ক্ষেত্রেও সে অগ্রণী। তার স্বামী 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' থেকে ফিরে প্রসন্নর সঙ্গে কি রকম আচরণ করেছিল, তা সবিশেষ জানা থাকলেও তার মুখ থেকেই সবার সামনে আবার তা সে জানতে চায়। প্রসন্ন লজ্জায় সবার সামনে তা বলতে রাজী না হলে সে-ই বিস্তৃতভাবে সবাইকে তা শোনায় এবং তাকে "তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে"—একথা বলে। এর মধ্যে তার নির্লজ্জ আদিরসাত্মক রসিকতার পরিচয় মিললেও, প্রসন্নর প্রতি

প্রসন্নর একটি সমবেদনার ভাবও প্রকাশ পায়। পরিশেষে সে "হায় এই কল্-কেতায়" ইত্যাদি বলে যে আক্ষেপোক্তি করেছে তাতে সংলাপ কিছুটা বক্তৃতা-ধর্মী হয়ে উঠলেও তার মনোবেদনা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। এই কারণেই নৃত্যকালীর লুকিয়ে তামাশা দেখার প্রস্তাবে সে সায় দিতে পারেনি—বুক কেটে তার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল।

প্রসন্নময়ী—

নবকুমারের বোন। স্বামীপরিত্যক্তা। কাজেই, পিত্রালয়েই তাকে বাস করতে হয়। হরকামিনীর সঙ্গে সঙ্গেই একে আমরা দেখতে পাই। তার প্রতি হরকামিনীর একটা সমবেদনাও দেখা যায়। চরিত্রটি নানা দিক দিয়ে খুবই উজ্জ্বল। সকলে তাসখেলায় মগ্ন থাকলেও মায়ের ডাক তারই কানে প্রথম পৌঁছয়। সকলকে এব্যাপারে সচেতন ক'রে দেয় সে-ই। তার হুঁশিয়ারী এবং তৎপরতাও অসাধারণ। তার সাড়া না পেয়ে মা যখন 'ও বোউ' বলে ডাকেন, হরকামিনীর আগে সে-ই সাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিলম্বের কারণস্বরূপ চকিতে দাদার বিছানা পাড়ার অজুহাত খাড়া ক'রে দেয়। হরকামিনীর তাস লুকানোর অনুরোধ উচ্চারিত হতে না হতেই সে তা মুহূর্তে বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলে। শুধু এইটুকু করেই সে ক্ষান্ত হয় না "আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্তে থাকি, তা হলে মা কিছু টের পাবেন না"—চকিতের মধ্যে এই অভিনব পরিকল্পনাটিও তারই আবিষ্কার। তবে হরকামিনীর তুলনায় চরিত্রটি নিঃসন্দেহে লজ্জাশীলা। তার প্রতি তার দাদার সেদিনকার আচরণটির কথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করবার জন্যে হরকামিনী পীড়াপীড়ি করলে সে বলে, "না ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্লেম।" এরপর মত্ত অবস্থায় ফিরে এসে নব যখন হল্লা শুরু ক'রে দিল এবং হরকামিনী প্রসন্নকে তাকে চুপ করাবার জন্যে অনুরোধ জানাল, সে তার পূর্ব আচরণের কথা স্মরণ ক'রে লজ্জাবশতই সে-কাজে অগ্রসর হতে পারেনি। অবশ্য এ-চরিত্রে রসবোধের অভাব নেই। মত্ত নব স্ত্রীকে পয়োধরীজ্ঞানে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে যেতে থাকলে হরকামিনী যখন প্রসন্নকে এসবের সে কিছু বুঝছে কিনা জিজ্ঞেস করল, তখন জবাবে সে সহাস্যে বলেছিল: "ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?" ঘটনায় একেবারে শেষাংশে হরকামিনীর বিলাপোক্তির পর প্রসন্নর 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে" কথাগুলিও লক্ষ্য

করবার মতো। এখানে 'জ্ঞান' কথাটির উপর সে যেভাবে ব্যঙ্গের শরনিক্ষেপ করেছে, তা তার পরিহাস রসিকতার এবং সেইসঙ্গে হরকামিনীর প্রতি তার কিছুটা সমবেদনারও ইঙ্গিত দেয়।

নৃত্যকালী—

নবর খুড়তুতো বোন। তাই গৃহকর্ত্রীকে সে 'জেঠাই মা' বলে ডাকে। তাস-খেলায় মত্ত হলে তার কোন দিকে হুঁশ থাকে না। কাজেই তাঁর ডাক শুনে হরকামিনী ও প্রসন্ন যখন খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কমলার সঙ্গে সে বিনা ভ্রূক্ষেপেই তাসখেলা নিয়ে তর্ক চালিয়ে যায়! অবশ্য অন্যসময় তাকে একেবারে বেহুঁশ বলা চলে না। দাদার মুখ থেকে বের হওয়া মদের দুর্গন্ধ সম্পর্কে জেঠাইমাকে সে-ই প্রথম সচেতন করে। তামাশা দেখা এবং আদিরসাত্মক কৌতূহলও তার যথেষ্ট। প্রসন্নকে তার দাদার আচরণ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার ব্যাপারে হরকামিনী পীড়াপীড়ি করেও যখন সফল হল না, তখন নৃত্যও প্রসন্নকে তা বলবার জন্যে অনুরোধ জানায় এবং তাতে কাজ না হওয়ায় হরকামিনীকেই সে তা ব্যক্ত করতে বলে। এরপর মত্ত অবস্থায় নব বাড়ি ফিরলে সকলে মিলে লুকিয়ে তামাশা দেখার প্রস্তাবও তারই।

কমলা—

এ-চরিত্রের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তামাশা দেখার প্রবণতা এরও কিছুটা রয়েছে। নৃত্যকালীর তামাশা দেখার প্রস্তাবে হরকামিনী যখন উৎসাহ দেখাল না, তখন সে-ই "আয় লো আয়" বলে সকলকে ডাকল। নৃত্যকালীর মত তাসখেলায় মত্ত হলে এরও যে কোন দিকে হুঁশ থাকে না, তা নৃত্যকালীর প্রসঙ্গে পূর্বেই আমরা দেখেছি। অবশ্য অন্যসময় তারই মত একেও সম্পূর্ণ বেহুঁশ বা নির্বোধ মনে করা চলে না। কারণ, প্রসন্ন দাদা কোথায় গেছেন জানতে চাওয়ায় গিন্নিমা যখন 'রামমোহন রায়—না—কার কি সভা'র কথা উল্লেখ করেন, সে ঠিকই 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কথা ধরে নেয়। নেপথ্যে হুক্কার আওয়াজ শুনে সে মুহূর্তে বুঝতে পারে "ছোট্‌দাদা আসচেন" এবং সে সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সচেতনও ক'রে দেয়।

বারবিলাসিনীদ্বয়—

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এদের প্রথম জনের নাম 'পয়োধরী' এবং দ্বিতীয় জনের নাম 'নিতম্বিনী'। এদের নিজেদের কথাবার্তায় ও

আচার-আচরণে অশ্লীলতা, অমার্জিত ভঙ্গিমা, রুচিচ্যুতা, আদিরসাত্মক রসিকতা, এমন কি বিপর্যস্ত নৈতিকতার ছায়াপাতও লক্ষ্য করা যায়। তবুও চরিত্র দুটির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। থাকি "এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে" ছেড়েছে, কিন্তু 'ওয়ো' নামে অনৈক ব্যক্তির প্রতি রয়েছে তার আন্তরিক দুর্বলতা। তাই তার বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ক্ষুব্ধ করলেও, "মুড়ো খেজরা যে বিষ" ঝেড়ে দেবার এবং বাড়ি ফিরে এসে তার শ্রাদ্ধ করবার সংকল্প ঘোষণা করলেও, সে কার্যত তা যে পারবে না—বামা তা ভালো করেই জানে। সে অবশ্য থাকির তুলনায় অনেক কঠিন-হৃদয়। সে বলে: "তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি?··আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।" এরপরেই সেখানে বাবাজীর আবির্ভাব। হাতে তার কুঁড়োজালি থাকলেও থাকি "মিন্‌ষের রকম" দেখে তাকে একদৃষ্টিতেই চিনে নিয়েছে যে, সে "রসের বৈরিগী ঠাকুর।···যেন তুলসী-বনের বাঘ।" বাবাজী যখন তাদের 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কথা জিজ্ঞেস করল, তখন তারা 'তরঙ্গিণী' নামটির সূত্র ধরে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবেই আদি-রসাত্মক রসিকতায় মেতে উঠল এবং এব্যাপারে তারা দুজনেই প্রায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিল।

অন্যান্য—

আলোচিত চরিত্রগুলি ছাড়াও এই প্রহসনে চৌকিদার, বাজনদার, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মাতাল, পয়োধরী-নিতম্বিনী নামে দুজন খেম্‌টাওয়ালী—চরিত্রের অভাব নেই। কিন্তু সেই চরিত্রগুলি নিতান্তই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত বলে তাদের সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য চরিত্রগুলি প্রহসনটির ঘটনাগত বৈচিত্র্য-বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে নিঃসন্দেহে।

'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন': অসংগতির দ্বন্দ্ব

সমাজের নানা অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলে তাদের ওপর লঘু কৌতুকের ধারা-বর্ষণই প্রহসনকারের মূল লক্ষ্য। এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁকে চরিত্র

বর্ণন করতে হয়, সংলাপের অবতারণা করতে হয়, নানাবিধ নাটকীয় কৌশল-কেও অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এসব অনেকক্ষেত্রেই উপরি পাওনার মতো —প্রহসনের মূল উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করতে এতলো সাহায্য করে, তাকে কোথাও আচ্ছাদিত করে না।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনেও আমরা দেখি প্রহসনকার নানাবিধ অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলে তাকে কৌতুকের ধারায় নিষিক্ত করেছেন। প্রহসনটির একেবারে শেষাংশে দেখতে পাওয়া গেল, নায়ক নবকুমার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র কাজ শেষ ক'রে সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়ির সকলেই তার এই কুঅভ্যাসের কথা অল্পবিস্তর জানে; কিন্তু যিনি জানতেন না, তিনি স্বয়ং গৃহকর্তা। ইনি পরম বৈষ্ণব। নিজের সনাতন ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘকাল তীর্থে তীর্থে কাল কাটিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর সম্প্রতি বৃন্দাবনধাম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। ম্লেচ্ছ-আচার কলকাতাকে গ্রাস ক'রে ফেলে তাকে নরককুণ্ডে পরিণত ক'রে ফেলেছে এ বোধ তাঁর আছে। এখানকার কলুষিত আবহাওয়া যে-কোন মানুষের অধঃপতন ঘটাতে পারে—একথাও তিনি জানেন। কিন্তু স্বপ্নেও তিনি ভাবতে পারেন নি যে, 'মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী' কলকাতা তাঁর পুত্ররত্নটির এতখানি অধঃপতন ঘটাতে পারে!

অধঃপতন একদিনে ঘটেনা। মধ্যে মধ্যে তাঁর তীর্থযাত্রাহেতু অনুপস্থিতির সুযোগে এই সর্বনাশ ঘটেছে। তিনি বাড়িতে থাকলেও এসব ঘটনা তাঁকে জানতে দেওয়া হত না। স্বামীর কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে অনর্থ ঘটার ভয় হরকামিনী দেবীকে এবং পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধতা গিন্নিমাকে নবকুমারের উচ্ছৃঙ্খল চাল-চলন গোপন ক'রে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছে। বাড়ির চাকর বৈদ্যনাথও অকারণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায়নি বলেই নিরপেক্ষ মুখ নিয়ে চলেছে। কিন্তু পাপ চিরকাল ঢাকা থাকে না। মত্ত নবর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রত্যক্ষ ক'রে কর্তা ঠিকই বুঝতে পারলেন তাঁর পুত্রের আসল রোগ কোথায় এবং তার কারণই বা কি—তা তাঁকে নবর মা যতই "আমার দুধের বাছাকে কি কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে না কি" কিংবা "ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি" বলে বোঝাতে আসুন না কেন। কর্তার সিদ্ধান্ত নিতে তাই দেরি হল না: "কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই।

চল, এখন আমরা যাই। এই বানরটা একটু মুতুক—"। এরই উত্তরে নবকুমার বলেছিল: "হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।"

কথাগুলো সে বলে নেশার ঝোঁকে—সুস্থ অবস্থায় পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে বলেনি। তাই এর মধ্যে অসংগতির একটা ভাব ফুটে উঠে একদিকে যেমন হাস্যরসের জন্ম দিল, অন্যদিকে আকস্মিকভাবেই হয়ে উঠল গভীর তাৎপর্যবহ। কর্তার প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ তার কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানো। ফলে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা ভবিষ্যতে তার পক্ষে যে আর সম্ভব হবে না—একথা ভেবে দেখার ক্ষমতা বেচারার আর ছিল না। এই প্রত্যক্ষ কারণটুকু এক ধরণের হাস্যরসের জন্ম দিল।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে অসংগতিজনিত প্রহসনের এই যে হাস্যরস, তা ঘনীভূত হবার অবকাশ পায়, যদি তার মূল আরো গভীরে নিহিত থাকে, তবেই। এখানেও আমরা দেখব মর্মমূল কত গভীরে নিহিত থেকে আরো কত বিচিত্র অসংগতির ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে। নবকুমারের উক্ত উক্তির তাৎপর্য সন্ধানের ক্ষেত্রে ড. ক্ষেত্র গুপ্তের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য: "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বহু উচ্চারিত এই বাক্যাংশগুলি তার অসার-প্রায় মস্তিষ্কে কতকগুলি গ্রন্থির সৃষ্টি করেছিল। কর্তার তর্জনগর্জনের মুখে গ্রন্থি খুলে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে সেই কথাগুলিই যেন প্রকাশ পেয়েছে।" এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল নবকুমারের ঐ উক্তিটি তার অবচেতন মনেরই বহিঃপ্রকাশের ফল। কিন্তু সে জানত কর্তার বিরুদ্ধ পথেরই পথিক। অথচ, এখানে সে যে কর্তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে, তা আসলে চেতন-অবচেতন মনের বৈপরীত্যজাত অসংগতিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আবার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় সে বক্তৃতাকারে প্রস্তাব রেখেছে, আর মত্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে তাকেই সে সমর্থন করছে—এ-ও আর এক ধরনের অসংগতি। একেও আমরা চেতন-অবচেতন মনের বৈপরীত্যজাত অসংগতিরই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

তার মনের চেতন-স্তরেও অসংগতির অভাব নেই। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় সে যে বক্তৃতা দিয়েছে, তার পাঁচটি বাক্যাংশ লক্ষ্য করবার মতো—(১) "আমরা এখানে যাঁট করো যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি।" (২) "আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি।" (৩) "মেয়েদের এজুকেট

কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও।" (৪) "এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের পিঁজরাটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান।" (৫) "এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর। জেণ্টেলমেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভস্।"

প্রথম বাক্যে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হল। কিন্তু সেদিনের ঘটনাতে তো নয়-ই, অতীতে কোন কোন দিন সেখানে জ্ঞানচর্চা হয়েছিল বা ভবিষ্যতে কোন দিন হবে—সমস্ত ঘটনাতে তার ক্ষীণ আভাসটুকুও মিলল না। তর্কের খাতিরে যদি বা ধরে নেওয়া যায় তাঁরা উক্ত জ্ঞানচর্চা চালাতেন এবং তারই বলে তাঁদের পক্ষে "সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী" হওয়া সম্ভবপর হয়েছে—তাহলে তাঁরা আবার নতুন এক কুসংস্কারের আবর্তে এসে পড়লেন কেন? নিষিদ্ধ মাংস-ভক্ষণ, পিতাকে ছলনা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, উৎকোচ-প্রদান, মদ্যপান এবং বারাঙ্গনা-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া—এসব করলেই আমরা উন্নত হয়ে উঠতে পারব—যুক্তিবোধহীনভাবে এসবে বিশ্বাস স্থাপন করাটাও তো এক ধরনের কুসংস্কার! সুতরাং কুসংস্কার মুক্ত তাঁরা হতে পারেননি, বা সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও তাঁদের প্রকৃত চেষ্টা নেই দেখা গেল। তৃতীয় বাক্যে সমাজসংস্কারের কতকগুলো পন্থানির্দেশ তাঁরা করছেন। এসব ব্যাপার আমাদের শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যদি কেবল কথার কথা হয়েই থাকে? বক্তার নিজের বাড়িতেই দেখা গেল স্ত্রীস্বাধীনতার বা নারীশিক্ষার বিন্দুমাত্র লক্ষণই নেই! সে বাড়ির মেয়েরা পরিশ্রমী নয়, কর্তব্যপরায়ণা নয়, বরং মিথ্যা ভাষণে পটিয়সী। যেমন গিন্নিমা তারা কি করছে জানতে চাওয়ায় তাসখেলার ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে সকলে চাদরের খুঁটটা ধরে দাদার বিছানা পাড়া হচ্ছে বলে বেমালুম জানিয়ে দিল। গৃহাঙ্গনাদের কারোকে কোন হাল্কা ধরনের বই পড়তেও কোথাও দেখা যায় নি। তারা তাস খেলে সময় কাটায়, নিজেদের মধ্যে স্থূল আদিরসাত্মক রসিকতা করে, উচ্চারণে তাদের ভাষাগত বিকৃতি। এসব আর যাই হক, স্ত্রীশিক্ষার পরিচায়ক নয়। আর স্ত্রীস্বাধীনতা? নবর অত্যাচারী চালচলনে অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী হরকামিনী কখনো বাপের বাড়ি পালাতে চেয়েছে, কখনো গলায় দড়ি দিয়ে নিষ্কৃতি লাভের সোজা রাস্তা খুঁজেছে। বক্তৃতায় বলা ঐসব মহৎ আদর্শের সামান্য প্রভাব যে নিজের ঘরের কোণটুকুতেও ফেলতে পারেনি, তার কথা ও কাজ আত্যন্ত অসংগতিতে ভরা

বৈকি! চতুর্থ বাক্যে সে সভাগৃহটিকে 'স্বাধীনতার দালান' আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ যে কত সংকীর্ণ, কত বিভ্রান্তিকর, তা পঞ্চম বাক্য-দ্বয়ের প্রথমটিতে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা তার কাছে যার যা খুশি তাই করা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তাকে শেষ পর্যন্ত "লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ার-সেল্ভস্" বলে মদ্যপান-বারাঙ্গনাবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয়েছে। অথচ, তৃতীয় বাক্যে কথিত মহৎ আদর্শগুলো রূপায়ণের ক্ষেত্রে এইসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যে রীতিমত প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি ক'রে থাকে—সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই দেখা গেল তার সচেতন মনের সৃষ্টি যে বক্তৃতার বস্তু, তা-ও আদ্যন্ত অসংগতিতে ভরা।

সুতরাং পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, "আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন"—নবকুমারের এই উক্তিটি প্রত্যক্ষভাবে অসংগতিজনিত হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছে। আর ঐ উক্তির সূত্র ধরে এ-ও দেখতে পাওয়া গেল, মনের চেতন-অবচেতন স্তর নির্বিশেষে সেই অসংগতির বীজ যেহেতু আরও গভীরে নিহিত, সেইহেতু তা প্রহসনের রসটিকে সম্পূর্ণ ঘনীভূত ক'রে তুলেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে উক্ত কথাটি আকস্মিকভাবে নবকুমারের উচ্চারণ করার ফলেই। অর্থাৎ একদিকে আকস্মিকতা, অপর দিকে অসংগতির বীজ গভীরে নিহিত থাকা—উভয়ের সংঘর্ষজনিত কারণে বাক্যটির মধ্য দিয়ে প্রহসনের কৌতুকরস ঘনীভূত আকার ধারণ করেছে।

লঘু বিদ্রূপবর্ষণ

'একেই কি বলে সভ্যতা' দুই অঙ্কে বিভক্ত, আবার প্রতি অঙ্কেই রয়েছে দুটি দৃশ্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে "প্রথম দুটি দৃশ্যে ঘটনার প্রস্তুতি, শেষের দুটি দৃশ্যে তার ফলাফল দেখান হয়েছে।" সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেছে উত্তর কলকাতার কোন বনেদী অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে। আবার সব কিছু ঘটতে সময় লেগেছে মোট পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশি নয়। ঘটনাস্থল দুটি—বাড়ি এবং সিকদার পাড়া স্ট্রীটের বারাঙ্গনাপল্লী তথা 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র স্থান। বাড়ি থেকে সভার স্থান যে দূরবর্তী নয়, তা বোঝা গেল নব ও কালী বিকেল পাঁচটা বাজবার কিছু আগে বাড়ি থেকে বার হবার পর, কর্তাকর্তৃক তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে বাবাজী প্রেরিত হয়েছে এবং সে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সন্ধ্যার

ঠিক মুখেই। দূরত্ব বেশি হলে এটা নিশ্চয়ই সেযুগে সম্ভবপর হত না—যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত হয়নি। সুতরাং দেখা গেল ঘটনার অঙ্কে এবং দৃশ্যে কাল ও স্থানের ব্যবধান বিশেষ নেই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এর অঙ্কভেদেরও তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। তাই এর আয়তনও বেশ সংক্ষিপ্তই হয়েছে। প্রহসনে এইরকমের সংক্ষিপ্ততাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু শুধুই সংক্ষিপ্ত হলে হয় না—সমাজের নানা অন্যায় ও অসংগতি প্রদর্শন ক'রে প্রহসনকার তার ওপর নানাভাবে লঘু বিদ্রূপ বর্ষণ ক'রে থাকেন, ফলে হাস্যরসের জন্ম হয়। আলোচ্য প্রহসনেও আমরা দেখব প্রহসনকারের তেমন প্রবণতার অভাব নেই।

প্রহসনকার এখানে মূলত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত উনিশ শতকীয় 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যাধারী যুবকদের কালাপাহাড়ী ভূমিকাকে। এরা ইংরেজদের অনুকরণ করতে চায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলে এরা দাবি করে, তাই এদের মুখে ইংরেজি কথার খই ফোটে। এরা কুসংস্কার দূর ক'রে সমাজ-সংস্কার করতে চায়। কিন্তু এদের চারিত্রিক অসংগতি হল, এরা কথায় ও কাজে এক হতে পারে না—চায়ও না। কারণ, প্রকৃত সমাজ সংস্কার করতে হলে চাই চারিত্রিক দৃঢ়তা—প্রয়োজনে এর জন্যে ত্যাগস্বীকারেও প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু এদের দৃষ্টিশক্তি ঘৃণ্য ভোগাসক্তিতে আচ্ছন্ন। তাই এরা বক্তৃতাকালে "মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও"—এইসব বড় বড় কথা বলে বটে, কিন্তু দেখা যায় এদের ঘরের নারীরাই শিক্ষার আলোকে অলোকিত নয়। বইপড়ার পরিবর্তে তারা তাস খেলে সময় কাটায়, আদিরসাত্মক রসিকতা করে, উচ্চারণ ভঙ্গীতেও শিক্ষার লেশমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। আর স্ত্রীস্বাধীনতা? স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী বাপের বাড়ি পালিয়ে গিয়ে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়ে এসব থেকে মুক্তির সহজ পথ খোঁজে। বন্ধুর মিথ্যে পরিচয় দিয়ে পিতাকে প্রতারণা করতে কিংবা তাঁকে 'ওল্ড ফুল' বলে অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতে এইসব তথাকথিত সমাজসংস্কারকদের বাধে না, বিবেক বিদ্রোহ করে না কারোকে উৎকোচগ্রহণে প্রলুব্ধ ক'রে কাজ হাসিল করতে। নবকুমার চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এইসব অসংগতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে তাদের প্রতি অজস্র বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। আর এইসব অসংগতি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল, যখন দেখা গেল নবকুমার "লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভস্" বলে নিষিদ্ধ মাংস সহযোগে

মদ্যপান ও বারাঙ্গনাবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। এদের চোখে বাঈজী-নাচ আর সভাপতির বক্তৃতায় কোনো পার্থক্য নেই। দুই-ই সমান গুরুত্বহীন আর স্ফূর্তির খোরাক যোগাবার উপকরণবিশেষ। তাই নম্বর প্রস্তাবিত পয়োধরী-নিতম্বিনীর নাচের পরিবর্তে সকলের অনুরোধে আগে সভাপতি নববাবুর 'ইস্‌পীচ'-ই হয়ে গেল। এইরকম টুকরো টুকরো নানা ঘটনার অবতারণা ক'রে প্রহসনকার এই সব চরিত্রের নানা অসংগতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

নিরীহ বৈষ্ণব বাবাজীরাও প্রহসনকারের বিদ্রূপদৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তারা ধোয়া তুলসীপাতা নয়, বরং 'তুলসীবনের বাঘ'। তাই ফোঁটা কেটে, মুখে 'রাধে কৃষ্ণ' বলে কুঁড়োজালি হাতে নিলেও বারাঙ্গনাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে তাদের বাধে না। বারাঙ্গনাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েও যায়। তাই তারা পাঁচ সিকে পেলেই ভেক নিয়ে বৈষ্ণবের 'বষ্টুমী' হতে পারে বলে রসিকতা করে। মনের দিক থেকে যারা এতখানি পল্‌কা, তাদের তিলকফোঁটা কাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক; তাই জনৈক মাতাল "এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা? ... তুমি না সং সেজেচ?" —বলে জনৈক বৈষ্ণব বাবাজীকে বিদ্রূপ করে। পরেও আবার দেখি ধর্মবোধ তার দৃঢ় নয় বলে নবকুমারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে সে তার বশ মেনেছে। এক্ষেত্রে তার অপরাধ আরও দুটি—ঘুষ খাওয়া এবং কর্তাকে কিছু জানাবে না বলে স্বীকার করায় তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

পুলিস-কর্মচারীদের ওপরেও লেখক এক হাত নিয়েছেন। দুষ্টের দমন ক'রে নগরের শান্তিরক্ষা করা এদের কর্তব্য হলেও, এরা তা করে না—আর এ-ব্যাপারে বিদেশী সার্জেন্ট আর দেশী চৌকিদার দুই-ই সমান। নিষিদ্ধ পল্লীর আনাচে-কানাচে কি চলছে, সেদিকে এদের হুঁশ নেই। নিরপরাধ নিরীহ মানুষকে ভয় দেখিয়ে কি ক'রে দুপয়সা ঘুষ আদায় ক'রে নিতে হয় সে-বিদ্যা এরা ভাল করেই রপ্ত করেছে! সার্জেন্ট-বাবাজী প্রসঙ্গে ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রহসনকার বিদ্রূপ করেছেন একালের বাঙালি নারীদেরও। তিনি লক্ষ্য করেছেন তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তখনও তেমনভাবে ঘটেনি। ফলে, তারা একদিকে যেমন অত্যাচারী স্বামীদের উৎপীড়ন ও অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করে—প্রতিবাদটুকু করতে ভরসা পায় না; অপর দিকে তাসখেলা, ঝগড়া করা, তামাশা দেখা কিংবা আদিরসাত্মক রসিকতার মধ্যে দিয়েই অবসর কাটায়। গৃহস্থ একটু সম্পন্ন হলে মেয়েদের অলসতা পেয়ে বসে। সাংসারিক কাজকর্মে

ভাদের তৎপরতা আশ্চর্যজনকভাবে কমে যায়। গিন্নিমার মুখ দিয়ে প্রহসনকার ভাদের এই দিকটিকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যঙ্গরসে সিক্ত করেছেন। এদের প্রতি গিন্নিমার উক্তি: "তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না। ...তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সর্দ্দার হয়ে পড়েছিস্।"

শুধু নবীনারাই নয়, পুত্রস্নেহে অন্ধ প্রবীণারাও তাঁর ব্যঙ্গদৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি। প্রহসনটির একেবারে শেষ দৃশ্যে এর পরিচয় আমরা পাই। মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে নব যখন "আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্" বলে হরকামিনী-প্রসন্নর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন গিন্নিমাকে ডেকে আনানো হলে তিনি অবাক হয়ে মন্তব্য করলেন: "এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্ছে! ওমা, কি হলো?" নৃত্য বুঝিয়ে দিলে, "দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে?" তবুও তিনি কিছুই যেন বুঝতে পারলেন না; বিলাপের সুরে বললেন: "আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ্‌টিষ্‌ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ওমা, আমার কি হবে!"

ইতোমধ্যে ঘটেছে কর্তার আগমন। তিনি এক পলকেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিয়ে 'নরাধম', 'কুলাঙ্গার' প্রভৃতি বলে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু গিন্নিমার তখনও বিস্ময়: "আমার সোনার নবকে অমন করো বক্‌চো কেন?" নব কিন্তু আপন মনে প্রলাপ বকে চলেছে। কর্তার ক্রোধ ক্রমশ বাড়ছে। গিন্নিমা মন্তব্য করলেন: "ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি!" এরই এক ফাঁকে নেশার ঝোঁকে নব তিরস্কাররত বাবাকেই পরিষ্কার বলে বসে: "মদ্ লাও।" মায়ের তবুও যে কিছুই বিশ্বাস হয় না: "আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা?" কর্তা তখন স্পষ্টভাবেই সঙ্গদোষের প্রসঙ্গ তুললেন। মায়ের তবুও যেন সেই অবোধ বিস্ময় ভাঙতে চায় না: "ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা?" গিন্নিমার সরলতা প্রদর্শন করবার জন্যে প্রহসনকার নিশ্চয়ই এতখানি সংলাপবদ্ধ চিত্রের অবতারণা করেননি। আসলে তিনি এই চিত্রের মাধ্যমে বাঙালি মায়েদের স্নেহান্ধতাকেই কৌতুকরসে সিক্ত করতে চেয়েছেন। আর সেই কাজের জন্যে তাঁকে প্রসন্ন, নৃত্য, কর্তা প্রভৃতির উক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে।

'সৎসাহিত্য'রূপে গ্রহণযোগ্যতা বিচার

পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Allardyce Nicoll 'নাটকীয়' শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁর "Theory of Drama" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "The word dramatic has a connotation signifying the un-expected with, usually, the suggestion of a certain shock occasioned either by a strange coincidence or by departure of the incidents narrated from the ordinary tenor of daily life." (p. 36)। অর্থাৎ তাঁর মতে, অপ্রত্যাশিতের অভিঘাতজনিত চমক, অদ্ভুত ঘটনার সমন্বয়, অথবা প্রাত্যহিক জীবনধারার আকস্মিক ভিন্নমুখী হওয়ার কারণে সৃষ্ট বিস্ময়-চমকই নাটকীয় ভাবের মূল। এই নাটকীয়ভাব প্রহসনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাধারণত পরিপূর্ণভাবে দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এই নাটকীয় ভাবও নাট্যবস্তুর প্রতি পাঠক-দর্শককে আকৃষ্ট করবার অন্যতম উপায়। কাজেই সমসাময়িক সমাজের যে-সব দোষ, ত্রুটি, অনাচার ইত্যাদি নিয়ে প্রহসন রচিত হয়, কালের পরিবর্তনে জনমানসে তার আবেদন ক্ষীণ হয়ে এলে, প্রহসনটির জনপ্রিয়তাও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর "মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার" গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন : "প্রহসন তখনই সৎসাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যখন তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আভাস থাকে এবং প্লটের মধ্যে আকস্মিক ও প্রত্যা-শিতের সমন্বয় হয়।'. (পৃঃ ১৪৯)। 'সৎসাহিত্য' বলতে তিনি এখানে 'প্রকৃত সাহিত্য' বুঝিয়েছেন—যার মূল্য সমকালীন সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনটুকু ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। সেই দিক দিয়ে বিচার ক'রে তিনি 'একেই বলে কি সভ্যতা'কে তাই উচ্চশ্রেণীর প্রহসন বলে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। আমরা এখন তাঁর সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরপেক্ষভাবে এক-বার বিচার করে দেখব।

অধ্যাপক সেনগুপ্ত যদিও "ইহার কাহিনীতে বা চরিত্রসৃষ্টিতে কোন অভি-নবত্ব নাই" বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর সেই অভিমতকে বিনা

বিচারে মেনে নেওয়া চলে না। সর্বপ্রথম এটির বিষয়বস্তুগত অভিনবত্ব তথা বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত পাশ্চাত্য শিক্ষাস্পর্শে উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই উদ্ভূত, এক শ্রেণীর যুবকদের কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তির প্রতি এই প্রহসনে কৌতুকদৃষ্টিপাত করেছেন মাইকেল মধুসূদন। তাঁর পূর্বেও সামাজিক প্রহসনের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যরীতিতে রচিত এবং বিষয়বস্তুগত এই অভিনবত্ব পূর্ববর্তী যুগে কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না।

এর পরেই মনে হয় এটির ঘটনাগত বৈচিত্র্যের কথা। সামান্ত কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই ক্ষুদ্র প্রহসনে ঘটনার অভাব নেই। নবকুমার ও কালীনাথ কর্তৃক কর্তাকে প্রতারণা, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্তে বাবাজীকে প্রেরণ, ক্রমান্বয়ে মাতাল-বারাঙ্গনা-পুলিস সার্জেন্ট-বাবুর্চি প্রভৃতি সহযোগে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র নামে বাবুদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, নবকুমারদের বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের অলস জীবনযাত্রা ও অবসর বিনোদনের চিত্র, মাতাল অবস্থায় নবকুমারের ঘরে ফিরে নানা উপদ্রবে রত হওয়া প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনাবস্তু এতে রয়েছে। এককথায় এটিকে নানা ঘটনার চিত্রমালা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রহসনের মূল লক্ষ্য নানা অসংগতিকে প্রদর্শন ক'রে কৌতুকরসকে জাগিয়ে তোলা। সে লক্ষ্যে প্রহসনকার অবশ্য স্থির আছেন। কিন্তু তবুও ঘটনাগুলো আমাদের মনে স্বতন্ত্র রসাবেদনও জাগিয়ে তোলে। কোথাও কৌতূহল, কোথাও ধর্মীয় ভাবালুতা, কোথাও আদিরস, কোথাও বেদনা এবং সর্বোপরি এদের মধ্যে যে অসংগতির ভাব ফুটে ওঠে তাকে ভিত্তি ক'রে হাস্যরস।

নানা চরিত্র-সৃজনের মধ্যে দিয়ে ঐসব ঘটনাকে রূপদান করা হয়েছে। সুতরাং সংগত কারণে চরিত্র সৃষ্টিতেও রয়েছে বৈচিত্র্যের আভাস। কত অভিনব ধরনের চরিত্র! যেমন কর্তা—তাঁর মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণবভাবালুতার অতিরেক। 'জয়দেবের'র সামান্ত নামটুকু শ্রবণেই তিনি আত্মহারা হয়ে যান। অথচ সব ব্যাপারে কী প্রখর দৃষ্টিশক্তি তাঁর! নবকুমার-কালীনাথের নিপুণ অভিনয়ও তাঁর সন্দেহ উদ্রেকের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেনি; প্রেরণ করেছেন তিনি বাবাজীকে, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্তে। গিন্নি তাঁকে যতই ভুল বোঝাবার চেষ্টা করুন, তিনি এক দৃষ্টিতেই ধরতে পারেন নবকুমারের মত্ততার আসল কারণটি কি। কর্তব্য স্থিরীকরণেও তাঁর এক মুহূর্ত দেরি হয় না।

মত্ত নবকে আপাত ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে সকলকে নিয়ে পর দিন তিনি বৃন্দাবনযাত্রার সংকল্প করেন। গিন্নিমার মধ্যে আমরা সংসারে সকল বিষয়ে সজাগ দৃষ্টির পাশাপাশি স্নেহান্ধ মাতৃহৃদয়কে প্রত্যক্ষ করি। নবকুমার কালীনাথের তো কথাই নেই। তাদের কথায় ও কাজে যে নানা অসংগতি ফুটে উঠেছে, তা চিত্রিত ক'রে প্রহসনকার তাদের সজীব ক'রে তুলেছেন। চৈতন্ত-শিবু-বলাই-মহেশ প্রভৃতি নবর বন্ধুদের মধ্যে বিচিত্র মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রহসনকার সামান্ত আয়াসেই। কেউ ঈর্ষান্বিত, কেউ দোলাচল প্রবৃত্তির অধিকারী, কেউ বা সুযোগ-সন্ধানী। বাবাজীর মধ্যে প্রাধান্ত পেয়েছে তার ভণ্ডামী। কন্তা, পুত্রবধূ, দাস, দাসী ইত্যাদির সহযোগে প্রত্যক্ষতা পেয়েছে নবকুমারদের বাড়ির ভিতরকার নিত্য জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। তাদের বিভিন্ন মানসিকতার চিত্রও এখানে অবহেলিত নয়। মাতাল, বারাঙ্গনা, পুলিস সার্জেন্ট, চৌকিদার, বরফ-বেলফুলও'লা, বাবুর্চি প্রভৃতি আরও কতনা বিচিত্র ধরনের মানুষের সমাবেশ যে এখানে লক্ষ্য করা যায়, ভাবলে অবাক হতে হয়। এইসব চরিত্রকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্ব-জটিলতার সৃষ্টি ক'রে পূর্ণতাদান করবার অবকাশ প্রহসনকারের থাকতে পারে না। কিন্তু সেই সীমিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই তিনি তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, সজীবতা সম্পাদনে সক্ষম হয়েছেন, তা-ই তাঁর উচ্চ ক্ষমতার পরিচায়ক। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে তো চরিত্রগুলির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাই লিখেছেন: "তাহারা এমনই সজীব যে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে রক্ত ক্ষরিত হইবার আশঙ্কা।"

চরিত্র সজীব হয় সংলাপে। এখানে তাই সংলাপের বিচিত্রতাও চোখে পড়বার মতো। নবকুমার এবং কালীনাথ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তাদের কথায় 'মরাল করেজ', 'সুপরষ্টিসন', 'লিবরটি', 'রিফরম' প্রভৃতি ইংরেজি কথার ছড়াছড়ি। শব্দগুলি বক্তাদের একটা বিশেষ মেজাজ সৃষ্টিতেও সহায়তা করেছে। আবার তাদের ঔদ্ধত্য কিংবা বেপরোয়া মনোভাব যখন প্রকাশ পায় তখন 'ড্যাম' 'ওলড্ ফুল' প্রভৃতি শব্দ তাদের সংলাপে বেশি করে স্থান ক'রে নেয়। বাক্যগঠনেও ইংরেজিরীতির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত অনুভূত হয়। যেমন নব বলছে: "ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও।" কিংবা কালীর উক্তি: "ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে কেতর কর। আহা! কি সফট হাত!" এই কালীনাথই আবার যখন নিজেকে বৈষ্ণবকুলজ বলে মিথ্যে

পরিচয় দিয়ে কর্তাকে খুশি করে কাজ হাসিল করতে চায়, তখন তার সংলাপে একদিকে যেমন বিনয়ের ভাব এসে পড়ে, অন্যদিকে তৎসম শব্দের আধিক্য দেখা যায়। যেমন : "আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্মনির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই।" ভাষায় এই তৎসম শব্দের অতিরেক অন্যক্ষেত্রে হয়ত সংলাপকে কৃত্রিম ক'রে তুলতো, কিন্তু এক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের কথা বিবেচনা করলে পুরোপুরি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কর্তার সংলাপে আছে বৈষ্ণব ভাবাবেগ এবং সংস্কৃতানুকারিতা। কিন্তু যখন তিনি মত্ত নবকুমারকে প্রত্যক্ষ ক'রে গিন্নির প্রতি রোষ প্রকাশ করেছেন, তখন আশ্চর্যজনকভাবে ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কমে গিয়ে তদ্ভব কিংবা অন্যান্য শ্রেণীর শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন : "ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি ?" নিরীহ বৈষ্ণব শিশুপুত্রকে হত্যার কথা বলায় তাঁর রাগের তীব্রতাও ঐ ছোট্ট সংলাপে ফুটে উঠেছে। "তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা" কিংবা "ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা"—নৃত্যকালী কিংবা গিন্নিমার এইসব সংলাপে একটা মেয়েলী বাচনভঙ্গী সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার, বারাঙ্গনা নারী হলেও অনেকটা স্বতন্ত্র, তাই তাদের ভাষায় এসেছে একটা অমার্জিত ভঙ্গী ও নির্লজ্জ পরিহাস-রসিকতা। যেমন : "ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্লি ?" কিংবা "আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসীবনের বাঘ।" বিদেশী পুলিস সার্জেন্ট। কথায় তার ইংরেজি শব্দের আধিক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কথা বলছে ইংরেজি-জ্ঞানহীন বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গে। তাই ভাষা যাতে তার সহজে বোধগম্য হয়, সেইজন্যে ইংরেজি থাকলেও তার সঙ্গে হিন্দি বাক্-ভঙ্গীর রয়েছে অপূর্ব মিশ্রণ। ভাষায় ধমক তথা হুকুমের ভাব এবং দেশীয় মানুষদের প্রতি তার অবজ্ঞাও প্রকাশ পাচ্ছে। আর, এই এতগুলো দিককে দ্যোতিত করেছে তার সংক্ষিপ্ত একটি সংলাপ : "চুপরাও, ইউ ব্লাডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা যোগমে কিয়া হেয়।" মুসলমান বাবুর্চিদের ভাষায় রয়েছে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণভঙ্গী : "দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়া-দারির মজা করে নেলে।" নিজেদের রিক্ত বঞ্চিত কর্মক্লান্ত জীবনের একটা দীর্ঘশ্বাসও এখানে অশ্রুত থাকে না। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই সংলাপের ক্ষেত্রেও কত বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে এসেছেন প্রহসনকার।

এবারে আমরা দেখব, প্লটের মধ্যে একদিকে যেমন বহু আকস্মিক ঘটনা রয়েছে, পাশাপাশি প্রত্যাশিত ঘটনা রয়েছে প্রচুর। প্রহসনকার কতখানি

তাদের সমন্বয়-সাধন করতে পেরেছেন, তা-ই বিচার্য বিষয়। প্রহসনটির শুরুতেই একটি আকস্মিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা হল, বৃন্দাবনধাম থেকে কর্তার সহসা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। পুত্র নবর গতিবিধির ওপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকে এড়িয়ে নবর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ, বন্ধু কালীনাথ তাকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র জরুরী বৈঠকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। নব উপায় ভাবতে থাকে। উপায় বার হল। বন্ধু কালীনাথ তার পরিকল্পনামাফিক নিজেকে বৈষ্ণব-সন্তানরূপে পরিচয় দেওয়ায়, তার সঙ্গে নবর উক্ত সভায় যাবার অনুমতি মিলে গেল সহজেই। ইতোপূর্বে নবর যে সুকৌশলী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে তার পক্ষে ঐ ধরনের কোন উপায় আবিষ্কার করা সহজসাধ্য এবং প্রত্যাশিত ব্যাপার। আবার তার পাশাপাশি কালীনাথের বেসামাল আচরণ, স্মৃতিবিভ্রাটগত কারণে বৈষ্ণব গ্রন্থদ্বয়ের নাম এলোমেলোভাবে উচ্চারণ—কর্তার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। কাজেই তাঁর মত হুঁশিয়ার মানুষের পক্ষে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাবাজীকে তাদের পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া কিংবা ঐরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়াটাও প্রত্যাশিত ব্যাপার। এইভাবেই প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আকস্মিক ও প্রত্যাশিত ঘটনার সমন্বয় সাধিত হল।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সেই সমন্বয় কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাবাজী আকস্মিকভাবে যে অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে এই রকমের অভিজ্ঞতালাভ প্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু ঘটনাধারার সঙ্গে তার যোগ বড়ই ক্ষীণ। এই গর্ভাঙ্কের শেষ দিকে আছে আর এক আকস্মিক ঘটনা—নবকুমার-কালীনাথের সেখানে একত্রে আবির্ভাব। তাদের আগমন অথবা তাদের দেখা পাওয়া, বাবাজীর কাছে অপ্রত্যাশিত কিংবা আকস্মিক নয়; যদিও বাবাজীর সাক্ষাৎলাভ কালীনাথ-নবকুমারের কাছে আকস্মিক—কারণ, বাবাজীকে যে তাদের পিছনে প্রেরণ করা হয়েছে, সে খবর ঘুণাক্ষরেও তারা জানত না; অনুমানও করেনি। যাই হক, বাবাজীকে দেখামাত্রই বুদ্ধিমান্ নব সমস্ত ব্যাপারটা এক মুহূর্তে অনুমান করে নিয়ে, উৎকোচদানে তাকে বশীভূত ক'রে ফেলল। এ-ও অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কারণ, নবর সুকৌশলী মনোভাবের এবং বাবাজীর চারিত্রিক নানাবিধ দুর্বলতার পরিচয় আমরা এর আগে পেয়েছি। আর এই ধরনের মানুষেরা যে সহজেই উৎকোচের বশীভূত হয়ে পড়বে এতে আর আশ্চর্য কোথায়? অবশ্য

এখানে আরও একটি কথা বলবার আছে। নবকুমার-কালীনাথ বেরোবার ঠিক পরেই কর্তা বাবাজীকে প্রেরণ করেছিলেন ; তাই তাদের পৌছবার অতক্ষণ আগে বাবাজী সেখানে গিয়ে পৌছাল কি করে ? কর্তা তাদের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে কারোকে প্রেরণ করতে পারেন, এমন আশঙ্কাও তো তাদের মনে জাগেনি — যার জন্যে তারা ঘুরপথে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ! যদি ধরে নিই, তারা অন্যত্র আনন্দ করতে করতে অবশেষে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। তা-ও বলা চলে না। সকাল সকাল কাজ সেরে বাড়ি ফেরার ইচ্ছার কথা তারা কর্তাকে জানিয়ে গেছে। কাজেই কর্তার প্রখর নজরের কথা মনে রেখে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র মূল কাজটুকু মিটিয়ে কালবিলম্ব না ক'রে নবর পক্ষে বাড়ি ফিরে আসা যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে পথে তার অতখানি কালক্ষেপণ করাটা ঠিক প্রত্যাশিত ব্যাপার হতে পারে না।

সভাগৃহের মধ্যে এই রকম আকস্মিক ঘটনা বিশেষ কিছু নেই। তবে, ঈর্ষাজনিত কারণে নবর অনুপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অপরকে সভাপতি ক'রে কাজ শুরু করবার ক্ষেত্রে মহেশ-বলাই-এর তৎপরতা, প্রবেশমাত্রই নবকে শিবুর "দ্যাট্‌স এ লাই" বলে আক্রমণ — এসব কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের চমক জাগিয়ে তোলে। কিন্তু নবর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং চৈতন্যের মধ্যস্থতা সমস্যার সমাধান ক'রে দেয়। যে নবর মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, যে নব 'মনি ম্যাটারে' সভাকে বরাবর সাহায্য ক'রে এসেছে, বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ যার গুণগ্রাহীও রয়েছে — সে সশরীরে একবার উপস্থিত হতে পারলে সমস্ত বিরোধী-চক্রান্তই যে মুহূর্তে ভেসে যাবে, সেটাই প্রত্যাশিত। এখানেও দেখি উক্ত চক্রান্ত ভেঙে যাওয়ায়, সেই আকস্মিকতা ও প্রত্যাশিত বিষয় সমন্বিত হয়েছে। এর পরে অবশ্য ফূর্তির যে জোয়ার বইতে শুরু করল, তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য সব বাধাকে অনায়াসেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

প্রহসনের একেবারে শেষ গর্ভাঙ্কে কিছু আকস্মিক ঘটনা আছে। নবকুমার-দের বাড়ির অন্তঃপুরিকারা অবেলায় তাসখেলায় মগ্ন। এমন সময় গিন্নিমা তারা কি করছে খোঁজ নিলেন। বিচক্ষণ গিন্নিমা কাজের সময় বাড়ির মেয়েদের এরকম খোঁজ-খবর করতেই পারেন। তাকে ঠিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলা যায় না। তবে আত্মবিস্মৃত হয়ে মেয়েরা যেভাবে তাসখেলায় মগ্ন ছিল, তাতে ঐ জাতীয় তল্লাশ নিঃসন্দেহে তাদের পক্ষে আকস্মিক। প্রসন্ন উঁচু গলায় দাদার বিছানা পাতার কথা জানাতেও যখন গিন্নিমার ওপরে এসে সব কিছু দেখে

যাবার ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তখন হরকামিনী তাস লুকোতে বলে গিন্নিমাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে সকলকে চাদর ধরতে বলল। গিন্নিমা এলেন, দেখলেন, অতঃপর আধুনিকাদের অলসতা সম্পর্কে কটাক্ষপাত ক'রে নীচে নেমে গেলেন। এইভাবে তার একটা আপাত সমাধান হয়ে গেল। অবশ্য প্রসন্ন ও হরকামিনীর চতুরতার কথা মনে রাখলে, এইরকম সমাধানই প্রত্যাশিত। কিন্তু, নবকুমার-কালীনাথের মূল ঘটনাধারার সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই প্রতিচ্ছবির প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নেই। যদিও তাদের মুখে একবার সভা থেকে ফিরে বাড়িতে নব কি রকম আচরণ ক'রে থাকে, বিশেষত তার বোনের সঙ্গে, সেকথা ব্যক্ত হয়েছে। এই সময়ে আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় নবকুমার ঘরে ফিরল। শুরু হল তার বিসদৃশ আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা। নবকুমার কোথায় গেছে, সেখান থেকে কি অবস্থায় বাড়ি ফেরে, এসব সম্পর্কে কর্তা ছাড়া বাড়ির সকলেই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। কাজেই তাদের কাছে এঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কর্তার কাছে তা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, দুই-ই। কারণ, তীর্থভ্রমণজনিত অনুপস্থিতিহেতু তিনি এসব ঘটনা বড় জানতেন না; আবার শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বাড়ির লোকেরাও এসব তাঁকে যতটা সম্ভব জানাত না। অবশ্য "কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই"—এ বোধ তাঁর ছিল, আর প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়ার ফলে পুত্রের আচার-আচরণ তাঁর মনে নিশ্চয় কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। তাই মত্ত অবস্থায় পুত্রের ঘরে ফেরা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও—পুরো মাত্রায় আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত অবশ্যই নয়।

যাই হক, এর পর পুত্রের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহান্ধতাবশত গিন্নিমা তার দুরাচারকে ঢাকবার কত চেষ্টাই না করলেন। কিন্তু কর্তার প্রখর দৃষ্টিশক্তিকে কিছুতেই আচ্ছাদিত করা বা তাঁকে বিভ্রান্ত করা কোনমতেই গেল না। তিনি পরদিন সকালেই সপরিবারে এই মহাপাপ নগর কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সিদ্ধান্ত আকস্মিক হলেও তাঁর মত প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তির কাছে অবশ্যই প্রত্যাশিত। এইভাবে আকস্মিক এবং প্রত্যাশিত ঘটনাবস্তু আবার সমন্বিত হল।

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসব, 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনটিতে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের ঘটনা কিংবা নবকুমারের বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র প্রভৃতি দু-একটি ক্ষেত্রের কথা

বাদ দিলে অন্যত্র প্রটের মধ্যে আকস্মিক ও প্রত্যাশিতের সমন্বয় অনেকখানি নিঃসাধিত হয়েছে। তাই সংসাহিত্যরূপে আলোচ্য প্রহসনের গ্রহণযোগ্যতা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা না গেলেও, সে সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানি সম্পর্কে সেকালের বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে "এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট"; যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়, "ইহা এই শ্রেণীর প্রহসনের আদর্শ"; আর 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'তে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন: "তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।" "The Calcutta Review' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের দুখানি প্রহসনের মধ্যে আবার এটিকেই উচ্চাসন দিলেন। তিনি লিখলেন: "His farces, however, are good. One of them, entitled 'Is this Civilization ?' is the best in the language." (April, 1871). মধুসূদন নিজে অবশ্য এই প্রহসন রচনা ক'রে যে ঠিক খুশি হননি, তা " 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্টতা" অধ্যায়ে একবার উল্লেখ করেছি। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন: I half regret having published those two things." অথচ, সেই রাজনারায়ণ বসুকেই লিখিত অন্য এক পত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama."

একালের সমালোচকেরাও প্রহসনখানি সম্পর্কে তাঁদের বিচিত্র রকম মত প্রকাশে বিরত থাকেননি। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে, " 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে উচ্চশ্রেণীর প্রহসন বলিয়া অভিনন্দিত করা যায় না। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে মদ্যপান করিত ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ঘরে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কথা সোজাসুজি বলার মধ্যে কোন সাহিত্যিক কৌশলের পরিচয় নাই।...ইহার কাহিনীতে বা চরিত্র-

সৃষ্টিতে কোন অভিনবত্ব নাই।" (দ্রঃ—'মধুসূদন : কবি নাট্যকার', পৃঃ ১৪৯-৫০)। এর ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর, 'মাইকেল রচনাসম্ভারে'র ভূমিকায়। সেখানে তিনি লিখছেন : "কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় এ দুখানিকে ত্রুটিহীন বলিলেই চলে।" আবার ড. ক্ষেত্র গুপ্ত দুই বিপরীত মতের মধ্যে একটা সমন্বয় ক'রে নিয়ে বলেছেন : " 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় দুর্বলতা আছে, কিন্তু সংলাপ রচনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে এর নিপুণতা অনস্বীকার্য। সমাজসমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন কবি, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত আচরণ ও প্রবণতাকেও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। রচনাটি তাই কোনক্রমেই সামান্য নয়।" (দ্রঃ—'নাট্যকার মধুসূদন', পৃঃ ১৭১)।

পূর্বোক্ত অভিমতগুলির নিরিখে প্রহসনখানির অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হব। এটির সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে কথা আমাদের মনে হয়, তা হল, নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের নানা চারিত্রিক অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলে তাকে কৌতুকরসে নিষিক্ত করাই এখানে প্রহসনকারের মূল লক্ষ্য। প্রহসনখানির নাম এবং পরিশেষে হরকামিনীর "মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয় ?"—এই প্রশ্নের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে সেই মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয়ও থাকে না। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, বৈষ্ণব বাবাজীর নীচতা, সার্জেন্ট-চৌকিদারদের দুর্নীতি, 'কলিকালের মেয়ে'দের আলস্য ও কর্তব্যহীনতা, বাঙালি মায়ের পুত্রস্নেহান্ধতা—এসব এখানে প্রদর্শন করা হল কেন? মূল সমস্যাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে অবশ্য অনেক সময় পার্শ্ববর্তী সমস্যাগুলো সহায়তা ক'রে থাকে এবং সেসবক্ষেত্রে ঐসব সমস্যার উপস্থাপনা দোষের হয় না। কিন্তু, এখানে ঐ সমস্যাগুলি মূল সমস্যাকে কতখানি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে, তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। যদি ধরে নিই, নবীনাদের আলস্য ও কর্তব্যহীনতার কবলিত হওয়ার পিছনে নববাবুদেরই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে অসামর্থ্য বিদ্যমান্ রয়েছে ; যদি ধরা যায়, পাশ্চাত্যশিক্ষার সুফললাভে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে যুবকদের নিশ্চেষ্ট অনুকরণ-প্রিয়তাই শুধু নয়, বাঙালি মায়েদের স্নেহান্ধতাও সমভাবে দায়ী—এসবও মধুসূদন তুলে ধরতে চেয়েছেন সেখানে, তাহলেও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কারণ, সমস্যাটিকে সেইভাবে তো চিত্রিত করা হয়নি কোথাও! বৈষ্ণব-বাবাজীর নীচতা প্রদর্শন কিংবা পুলিসের দুর্নীতিগ্রস্ততা তো মূলসমস্যার সঙ্গে

আরোই সংগতিবিহীন। বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের প্রসঙ্গ প্রহসনের বেশ কিছুটা অংশ অধিকার ক'রে রয়েছে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নবকুমার-কালীনাথের উপস্থিতিতে বিলম্ব ঘটানো ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে! অথচ তাদের এই বিলম্ব মূল ঘটনাধারার কোন প্রয়োজনকে তো সিদ্ধ করেই না— উপরন্তু তা অনেকখানি অস্বাভাবিকও ঠেকে। কারণ, প্রখর বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন কর্তাকে প্রতারণা ক'রে, তারা তাঁকে সকাল সকাল বাড়ি ফেরার আশ্বাস দিয়েই, তবে এখানে আসবার অনুমতি পেয়েছে। নবকুমারের মতো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই ঘটনার গুরুত্ব যে সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে তাড়াতাড়ি প্রধান কাজটুকু মিটিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, সেটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এই-ভাবে আমরা আরও দু-একটি ক্ষেত্রেও আকস্মিক ও প্রত্যাশিত যে ঠিকভাবে সমন্বিত হয়নি, তা দেখতে পাই। অন্যত্র এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত অবশ্য আরও একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন: "নবকুমার ও কালীনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় খুব বেশি অগ্রসর হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই।" কিন্তু একে ঠিক ত্রুটি বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করা মধুসূদনের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর ব্যঙ্গের বিষয় ছিল পাশ্চাত্যশিক্ষার অন্ধ-অনুকরণপ্রবণতা। আর উক্ত শিক্ষাধারার যেটুকু অংশের তারা সংস্পর্শে এসেছে, অসংগতিকে ফুটিয়ে তুলতে সেটুকুই হয়েছে যথেষ্ট।

আলোচ্য প্রহসনে আরও একটি অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তা হল গল্পগ্রন্থনে নিপুণতার অভাব। ড. ক্ষেত্র গুপ্তের অভিমত এ-প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'নাট্যকার মধুসূদন' গ্রন্থে লিখেছেন: "একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব—তার উৎপত্তি ও বিকাশ ও পরিণতি ঘটনাকে গল্পে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। বর্তমান প্রহসনটি সে সাহায্য থেকে বঞ্চিত।" (পৃ: ১৫৯)। আমরা দেখেছি এই প্রহসনে বহুবিধ ঘটনার অভাব নেই। কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বও রয়েছে এবং তা হল কর্তার পুরোনো জীবনাদর্শের সঙ্গে নবকুমার-কালী-নাথের পাশ্চাত্যবাদী আধুনিক জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়েছি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিহীন ঘটনার উপস্থাপনাও করা হয়েছে। যেমন, বাবাজীর প্রসঙ্গ। কাজেই সবকিছু মিলে একটি অখণ্ড কাহিনী গড়ে ওঠবার অবকাশ এখানে ঘটেনি। অবশ্য প্রহসনে অখণ্ড ও নিটোল কাহিনী সবসময় প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কাহিনীর একটা আভাসও তো থাকা চাই!

'একেই কি বলে সভ্যতা'র যে ঘটনাবলী চিত্রিত হয়েছে, তা সমকালীন সমাজের নিত্যপরিচিত এবং অতি সাধারণ পর্যায়ের ঘটনা। এইরকম ঘটনাকে আর যাই হক, ঠিক কাহিনী আখ্যা দেওয়া যায় না। কাহিনীতে আগন্ত একটা ঔৎসুক্য বজায় রাখার প্রয়োজন হয়। আর তা ফুটিয়ে তুলতে গেলেই সৃষ্টি করতে হয় বিশেষ কোন ঘটনাবর্তের। নইলে ঘটনাবলী (তাতে বৈচিত্র্যের যতই সমাবেশ ঘটুক না কেন) সাধারণ তথা মামুলী স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। আবার, ঘটনাবর্তের সৃষ্টিও আপনা থেকে হয় না, প্রতিবন্ধকতাই ঘটনাবর্তের সৃষ্টি ক'রে থাকে। প্রহসনটিতে সেই প্রতিবন্ধকতার অভাব বড় বেশি ক'রে নজরে পড়ে। ঘটনার সূচনাপর্বে আকস্মিকভাবে শ্রীবৃন্দাবন থেকে কর্তার প্রত্যাগমন একটা উল্লেখযোগ্য বাধার সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুকৌশলী নব অতি সহজেই তা কাটিয়ে উঠেছে। এর পর থেকে সমস্ত ঘটনাই যেন একটা নিস্তরঙ্গ সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়েছে। বাবাজীর উপস্থিতিকে আমাদের আরও একটা বাধা বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেটিও প্রকৃত বাধা নয়। কারণ উক্ত বাধাকে নবকুমার তার কৌশল-প্রয়োগে আরো সহজেই অতিক্রম ক'রে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, যে বাধা কোনো ঘটনাবর্ত সৃষ্টিতে কিংবা নতুন দিকে ঘটনা-প্রবাহের মোড় ফেরাতে সমর্থ নয়, তাকে এসব ক্ষেত্রে বাধাই বলা চলে না।

কাহিনী-গ্রন্থনে অসম্পূর্ণতাকে আরও এক দিক দিয়ে বিচার করা চলতে পারে। কোনো কাহিনী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যও বড় কম নয়। কিন্তু এই প্রহসনে নবকুমারের চরিত্রটি এতই প্রাধান্য পেয়েছে যে, আর কোন চরিত্র যেন চোখেই পড়তে চায় না। তাই পারস্পরিক সম্পর্কটি গড়ে উঠবে কিভাবে? কাহিনীতে নায়ক কিংবা নায়িকার চরিত্র অবশ্যই প্রাধান্য পায়। কিন্তু, প্রতি-নায়ক, প্রতি-নায়িকা প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রগুলো উপেক্ষিত হয় না। তাই সেখানে নিটোল একটি কাহিনী গড়ে ওঠবার অবকাশ থেকে যায়। আর, এই অভাবটিই এখানে বড় বেশি ক'রে আমরা অনুভব করি। এর সঙ্গে রয়েছে ইয়ং বেঙ্গলীয়দের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব এবং প্রচারধর্মিতা। প্রহসনে এগুলি থাকা অবশ্য দোষের কিছু নয়। কিন্তু চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে এগুলিকে অতিক্রম ক'রে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে একক ক'রে তুলতে প্রহসনকার প্রায় পারেন নি বললেই হয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি দুর্বলতা। ফলে কাহিনীসূত্র যে অনেকাংশে শিথিল

হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সমস্ত দিক দিয়ে মধুসূদনের পরবর্তী প্রহসন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিন্তু পুরো মাত্রায় সাফল্যলাভ করেছে। আসলে প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদনের শিক্ষা-নবিশীর কিছু স্বাক্ষর রয়ে গেছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী তিনি। তাই প্রায় সমকালে রচিত মাত্র দ্বিতীয় প্রয়াসেই তাঁর ঐসব অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রমণ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না ক'রে পারে না।

— • —

একেই কি বলে সভ্যতা ?*

[প্রহসন]

॥ চরিত্রলিপি ॥

পুরুষ : কর্তা (নবর বাবা তথা গৃহকর্তা) ; নবকুমার (কর্তার পুত্র) ; কালীনাথ (নবর বন্ধু) ; বাবাজী (কর্তার অনুচর) ; বৈদ্যনাথ ওরফে 'বোদে' (গৃহভৃত্য) ; বাবুদল (চৈতন্য, শিবু, বলাই, মহেশ—'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র সভ্যবৃন্দ) ; সারজন ; চৌকিদার ; যন্ত্রিগণ ; দরওয়ান ; মালী ; বরফওয়ালা ; মুটিয়াদ্বয় (প্রথমজনের নাম অজ্ঞাত, দ্বিতীয়জন 'কাদের মিঞা') ; খানসামা ; বেহারা ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক : গৃহিণী (নবর মা তথা গৃহকর্ত্রী) ; প্রসন্নময়ী (কর্তার কন্যা) ; হরকামিনী (নবর স্ত্রী) ; নৃত্যকালী (নবর খুড়তুতো বোন) ; কমলা (পরিচয় স্পষ্ট নয়, তবে সম্ভবত এ-ও নবর খুড়তুতো বোন) ; ঘেমটাওয়ালীদ্বয় (নিতম্বিনী ও পয়োধরী) ; বারবিলাসিনীদ্বয় (প্রথমজন 'খাকি', দ্বিতীয়জন 'বামা') ইত্যাদি।

---

* মধুসূদনের জীবদ্দশায় প্রহসনটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; প্রথম সংস্করণ ১২৬৬ বঙ্গাব্দে (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (১৮৬২ বা '৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)। "প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়।" [দ্রঃ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ।/০। বর্তমান মুদ্রণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৬৯)-ই অনুসৃত হল।

—সম্পাদক।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখছি এবলিশ কত্ত্যে হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ করো থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুখিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে?

নব। হষ্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্‌চি। (চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি

এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সদার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈষ্ণ। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ, শীঘ্র করে আন্ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা! (মদ্যপান।)

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কশুর করে? হা, হা, হা! (পুনর্ম্মদ্যপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা

বাগ্‌গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্‌ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌চেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তো চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তো হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখ্‌লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি ? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বল তো ; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ ! এম্‌নিই দেখ্‌ছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে ; আবার খাবে ?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্‌। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বল দেখি ?

নব। আর বল্‌বে কি ? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই ? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা !

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বল্‌বে বল দেখি ? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার ? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন ? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্‌ ঘোষ না পরম

বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্, এখন কি বল্‌বো ভাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল ছিল বটে, তার নাম, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সারলে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! তোমার কি চমৎকার মেমরি।

কালী। কেন, কেন?

নব। হস্! কর্ত্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ)

কালী। (প্রণাম।)

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি—৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র; যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল। এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখ্তে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্লে বাপু?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত-বিদ্যা আলোচনার জন্তে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায়

একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাজে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে, বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্ করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি কর্য়ো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলে টিকে কি একলা পাঠ্‌য়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্‌য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি। আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট্।

(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই? নব বাবুর সভাভবন কই? রাধেকৃষ্ণ। (পরিক্রমণ) তা, দেখি এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে। তুমি কে গা? কাকে খুঁজ্‌চো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

নেপথ্যে। ও পুঁটি দেক্‌তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে। ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ! রাধেকৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ) এই দেখ্‌চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্‌চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্‌বো?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ!

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি? হাঃ শালা।

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে?—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ।)

প্রথম। ওলো বামা, ওরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তো আস্তো পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি, এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি ত হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ ঘোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্যে রয়েছে, দেখ্?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্‌না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বোষ্টুমী হারয়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে

নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধেকৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার খাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ্যা, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই ভরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়্যে দাঁড়্যে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারেয়েছে আমার"।

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্যা, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিলআসান আস্চে, এর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখচি; এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বলো ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ।)

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আডমী ওচার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্ডী ডওড়কে যাও, উষ্টরক ডেকো, যাও—যাও—জলডী যাও, ইউ সুওর।

চৌকি। (বেগে অন্ত দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইটার, ইউ ফুল।

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা,

তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওস্তাক্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।

নেপথ্যে। উহুঁহুঁহুঁহুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ।)

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যো, গ্যো, গ্যো—

সার। হুং ইওর গো, গ্যো, গ্যো,—চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যোগমে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাডে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্‌গার্ড্। ইয়েহ, ব্যোগ্‌মে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্‌স্ রাইট্! ইউ স্যুটি ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা

রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্, হাম্ ডেক্‌টা ওকা কুচ্ কমুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ্ দিয়া নেহিঁ — আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ, হাঁ, ঐ বাড়ীমে — ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্ — (ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ্ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে — নইলে আজকে কি হাজতেই থাকৃতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেল বাক্‌স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ, আজ্ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্‌দান্‌টা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে স্তেলে। বেটারগো কি আরামের দীন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্, ও হারামখোর বেটারগো কি আর দীন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে স্তেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেপে ওট্‌তেচে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্স? উঃ, থু, থু, রাধেকৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

(মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ।)

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরা এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আগা নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

(যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ।)

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্রোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্‌বো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর জুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখ্‌তে পাবে এখন।*

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌চি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পূঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

---

* প্রহসনটির পরবর্তী সংস্করণে এই স্থানে সংযোজিত অংশ :—

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্‌লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশ্‌বী দেখ্‌তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্চি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্‌চি একবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এসব কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষে থাকবে?

(নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ।)

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা!

কালী। আরে ওসব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাকবে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাট্‌লেট্, কি মটন চপ্, খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্তো পারি।

কালী। ননসেন্স! তার চেয়ে শালাকে গোটাকতক কিক্ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্ দি ব্রূট্! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্ আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপ্‌নি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্‌ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কত্তো যাচ্ছি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্তত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতন্য। নব আর কালী যে আজ এত দেরী কর্‌ছে এর কারণ কি ?

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্‌বো ? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড্ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে ?

বলাই। বিটুইন আওয়ার্‌সেল্‌ভস, এমন কি জানে ?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে ! সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিগুলি মরের যে দুর্দ্দশা তা তো মনে আছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্‌টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্।

চৈতন। আঃ, তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্‌ছে—তা জান ?

মহেশ। তা ট্রুথ্, বল্‌বো তার আর ফ্রেণ্ড কি ?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক ; আমরাও তো মেম্বর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট্ করবার আবশ্যক কি ?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন ?

মহেশ। হিয়র্, হিয়র্, আমি এ মোসন সেকেণ্ড করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেক্‌সন নাই, একবার নেম্ কন—ব্রাভো ! হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজ্‌তে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্‌ করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেল্‌মেন্, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না, — নাউ টু বিজ্‌নেস্।

সকলে। হিয়র, হিয়র! (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা — বেয়ারা —

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক্ নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়।

সকলে। হিয়র, হিয়র।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ।)

চৈতন। সব্ বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্য পান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা — ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ্, খানিকটে বরফ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ।)

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিনতে পার? তবে ভাল আছ তো? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই ? আমার কি তেমন কপাল ?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার, (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

চৈতন। এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি ?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন ?—নব আসে নি বটে ?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না ?

চৈতন। না না, আবার কেন ? শুভ কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা। তাল খেম্‌টা

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে ॥
তখন্‌কার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায় পেতেম্ নিরবধি,
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন মজেছে ॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈত্তন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?

বলাই। সাকী আবার কি ?

চৈত্তন। যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার্ নহো সাকী"—তা, এসো (সকলের, মদ্য পান)।

চৈত্তন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্‌ছে না ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ।)

সকলে। (সকলে গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই আজ আমাদের এক্‌সকিউজ কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাট্‌স এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লায়র বল ? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করবো ?

চৈত্তন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ?

নব। ট্রাইফ্লীং ! ও আমাকে লাইয়র বল্লে—আবার ট্রাইফ্লীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈত্তন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো ?

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখচি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রাণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদ্যপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্পীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেওয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্‌চেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করো যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এও উই আর জলি গুড্ ফেলোজ্।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে স্নুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়!

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্‌ভস্।

(উপবেশন।)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুরে, হু—রে; লিবরটি হল্—
—বি ফ্রী—লেট অস এঞ্জয় আওয়রসেল্ভস্।

নব। ওরে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া)—থ্রী চিয়ার্স ফর্ আমাদের চ্যারম্যান।

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—হুরে! হু—রে—হুরে।

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নোবো, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফট হাত!

সকলে। ব্রাভো। (করতালি।)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি? হ্যাঁ, আছে। এই নেও (উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্‌লে ভাই ?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ক্রপ খেল্‌লি কেন ?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্‌ কেন ? হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে ?

হর। হাতে ক্রপ না থাকলে পাস দেবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

হর। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্‌, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমলা। বাঃ বিবি দেবে না তো কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে— ?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর্‌ ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্‌ নে ? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্‌তে পারিস্‌, তবে খেল্‌তে আসিস্‌ কেন ?

কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন ? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্‌ কেন ?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি ?

কমলা। বস্‌, তুই পাগল হলি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্‌, তবে অবিশ্যি টের পেতিস্‌।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয় ? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্‌ কর্‌ লো, চুপ্‌ কর্‌, ঐ শোন্‌, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্‌ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, লুকোও, ঠাকরুন দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্‌তে থাকি, তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্‌, ঐ দেখ্‌ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্‌, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্‌।

(গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্‌ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কৈন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্‌। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে— ?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে ! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোমা ভারি আহ্লাদের দিন ! দেখ,, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায় !

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো ? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি ! বল্ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন। আঃ, ছি !

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন। না ভাই, তুই, যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন ? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্।

হর। তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি ! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর

তাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ্যে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্ দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুক্যে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

(নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

নব। (পমস্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম্ কত্তে চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই। [প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (ঐ) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তার দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ভরাবি? যা না না।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা? কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো।

(গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্‌চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ওমা, এ কি হলো? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ওমা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ওমা, আমার কি হলো! ওমা, আমার কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্‌ত না। (প্রসন্নের প্রস্থান) ওমা, ওমা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই তো লো। ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ! আমার

দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ, টিষ, খাইয়ে দিয়েছে না কি ? ওমা, আমার কি হবে ! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ।)

কর্ত্তা। এ কি ?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে !

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধেকৃষ্ণ ! হা দুরাচার ! হা নরাধম ! হা কুলাঙ্গার !

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি ? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো্য বক্‌চো কেন ?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব ! হ্যাঁ ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি ?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ওমা, আবার কি হলো ! এমন এলোমেলো বক্‌চে কেন ? ওমা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে ?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো ?

গৃহিণী। ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা ?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে ? এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত ?

গৃহিণী। ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা ?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো ! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এই বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল ?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন।

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ, দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল। মদ্ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

(যবনিকা পতন।)

(ক) শব্দার্থ ও টীকা

প্রথমাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

কর্তা—গৃহকর্তা। নবকুমারের বাবা। **ভার**—দুরূহ, কঠিন। **এবলিশ**—Abolish। বিলোপ বা রহিত করা। **এত তুফানে নৌকা…দেওয়া উচিত?**—তুলনীয় বাঙ্‌লা প্রবাদ: 'তীরে এসেও হাল ছেড়ো না।' অর্থ: "নদী পার হইয়া তীরে পৌছিবামাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া নৌকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়; কারণ তখনও বিপদের সম্ভাবনা থাকে।" (দ্রঃ 'প্রবাদ-রত্নাকর', সত্যরঞ্জন সেন, পৃঃ ৪৬৪)। এখানে নবকুমারের প্রতি কালীনাথের বক্তব্য: অর্থের অভাব, পাঁচজনের সহযোগিতার অভাব প্রভৃতি অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে তারা 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'কে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সাফল্যের এই শেষ মুহূর্তে কর্তার ঘরে ফিরে আসার মত সামান্য কারণের অজুহাতে তাকে ভুলে দেওয়াটা ঠিক কাজ হবে না। **সবস্ক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট অতি পুয়র ছিল**—Subscription list অতি poor ছিল। অর্থাৎ চাঁদাদানে স্বীকৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা তাদের সংখ্যাল্পতার জন্যে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। **সেভ্**—Save। রক্ষা করা, টিঁকিয়ে রাখা। **তত্ত্ব করেন**—খোঁজ করেন। **এটেণ্ড দেবার**—Attend দেবার। উপস্থিত হবার। **হষ্**—Hush! চুপ্! **ব্রাণ্ডি**—Brandy। উগ্র মদ বিশেষ। **জষ্ট দি থিং**—Just the thing! তাই তো চাই! **রসো**—"[রহ+সহ (?)] অপেক্ষা কর ও সহিষ্ণু হও; ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর।" (দ্রঃ—'বঙ্গীয় শব্দকোষ', হরিচরণ বন্দ্যোঃ, পৃঃ ১৯০০)। **অকালের বাদল**—বাঙ্‌লা প্রবচন। অসময়ে মেঘ-বৃষ্টি হলে চাষাবাদ প্রভৃতি অনেক কাজ পণ্ড হয়ে যায়। এখানে এটি 'অপ্রত্যাশিত বাধা' অর্থে প্রযুক্ত। কর্তাই হলেন অকালের বাদল। কারণ, তাঁর উপস্থিতির ফলে নবকুমার-কালীনাথদের সবরকম স্ফূর্তিলাভের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। **প্লেজর**—Pleasure। স্ফূর্তি। মজা। **মনি ম্যাটারে**—Money matter+এ! আর্থিক ব্যাপারে! **সে রাবণও**

…লঙ্কাও নাই—তুলনীয় বাঙ্‌লা প্রবাদ : 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।' অতীতের যা-কিছু ভাল, বর্তমানে তার অভাব দেখা দিলে এইরকম আক্ষেপোক্তি করা হয়ে থাকে। কর্তার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে যা-খুশি করা চলত বলে নব তাঁর অনুপস্থিতির সময়টাকে রাবণের সোনার লঙ্কার সঙ্গে তুলনা ক'রে তা গত হয়ে গেছে বলে (অর্থাৎ কর্তা আকস্মিকভাবে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন বলে) আক্ষেপ করছে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে লঙ্কায় রাবণের মতো এ-বাড়িতেও এতদিন সে যেন একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। রামের উপস্থিতিতে রাবণের স্বাধীনতা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, সোনার লঙ্কা তাঁর যেমন হাত-ছাড়া হয়ে যায়, কর্তার উপস্থিতিতে তার নিজের অবস্থাও যেন অনেকটা তাই হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বিচরণের তার ক্ষমতা নেই। **যে গুড্ জেনেরেল …কশুর করে?**—Good General=ভাল বা দক্ষ সেনাপতি। Garrison+এ=দুর্গে। Provision=প্রতিরোধক ব্যবস্থা বা রসদ। কশুর (আরবি শব্দ—কুসুর)=ন্যূনতা, কমতি। অর্থ: দক্ষ সেনাপতি ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা ভেবে আগে থেকেই দুর্গে রসদ জমা করতে কার্পণ্য করে না। এখানে কালীনাথের বক্তব্য: আসন্ন বিপদের যে সংকেত পাওয়া যাচ্ছে, তার মোকাবিলার জন্যেই সে পাকস্থলী রূপ দুর্গে মদরূপ রসদ সঞ্চিত ক'রে রাখতে চায়। বলা বাহুল্য, মদ খাওয়ার পক্ষে এটি তার কল্পিত আত্মসমর্থনমূলক যুক্তি। মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড্ একেই 'প্রতিরক্ষণ কৌশলে'র (defence mechanism) অন্তর্ভুক্ত 'অপব্যাখ্যান' (rationalisation) বলে বর্ণনা করেছেন। **আমি তাই পান…পান কত্তে চাই**—'পান' শব্দটিকে কেন্দ্র ক'রে এখানে যমক অলংকার সৃষ্ট হয়েছে। নব কালীনাথকে পান খেয়ে মুখে মদের দুর্গন্ধ দূর করবার পরামর্শ দিলে, সে তা প্রত্যাখ্যান ক'রে আরও মদ্যপানের বাসনা প্রকাশ করে। এই উক্তি তার কৌতুকপূর্ণ শব্দক্রীড়ানৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। **আই সে**—I say। আমি বলি। ইংরেজি কথার মাত্রাবিশেষ। **আমি বিঞরের মুখটি…মহাপ্রসাদ পাই**—কালীনাথের এই দ্ব্যর্থক উক্তিটি শ্লেষ (Pun) অলংকারের অপূর্ব উদাহরণ। কুলীনেরা যে ভঙ্গীতে নিজ বংশপরিচয় দিয়ে থাকে, তার আভাস এখানে আছে। তাদের আত্মপরিচয়ে যথাক্রমে আদি-নিবাস, পদবী, বংশমর্যাদাজ্ঞাপক পরিচিতি, শ্বশুরকুলের পরিচয়, বৃত্তি প্রভৃতি সবই স্থান পায়। সকৌতুকে কালীনাথ প্রাচীনপন্থী কর্তাকে খুশি করতে যেন সেইরকম আত্মপরিচয়ই দিতে চাইছে। সে বলতে চায়: তাদের পূর্ব নিবাস

'বিএর' নামক স্থানে। সেখানকার তারা 'মুখোটি' বা 'মুখোপাধ্যায়' নামক সম্রান্ত কুলীনবংশজ। কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন তারা 'স্বকৃতভঙ্গ' অর্থাৎ মৌলিক ঘরের বা নিম্ন কুলের কন্যাকে বিবাহাদি করায় ভঙ্গ-কুলীনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বহুবিবাহ প্রথাকে অনুসরণ ক'রে কুলীনের বংশগৌরব এখনও সে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 'সোনাগাছি' নামক স্থানে সে এইরকম কত দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্তাদের যে উদ্ধার করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আর উইল্‌সন্ নামে জনৈক মহাভক্তের আশ্রয়ে রোজ দেব-নিবেদিত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেই সে দেহধারণ ক'রে বেঁচে আছে। অথচ এর প্রকৃত অর্থ এই: সে এমনই 'পাঁড়' বা পাকা মাতাল যে Beer (মদ বিশেষ)-এর বোতলের মুখটি খুলে নিয়ে, বা খুলিয়ে নিয়ে, খাবার ধৈর্যটুকুও তার নেই, কোনক্রমে নিজে ভেঙে নিয়েই সে তা গলাধঃকরণ করে। 'সোণাগাছি' আসলে উত্তর কলকাতার একটা পুরোনো পতিতা পল্লী—সেখানকার ঘরে ঘরেই সে রাত কাটায়। আর উইল্‌সন্ সাহেবের হোটেলে নিত্য সে নিষিদ্ধ খাদ্যাদি ভোজন ক'রে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়: "এ Pun-এর তুলনা বাংলা সাহিত্যে নাই—এ বোধকরি, কেবল পানশীল ব্যক্তির কল্পনাতেই আসিতে পারিত।" (দ্রঃ—'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', পৃঃ ৩৭)। উইল্‌সন্—উনিশ শতকে কলকাতা শহরের জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরেজ হোটেল-ব্যবসায়ী। কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের রচনাতেই এই নামটির উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্‌লা প্রবাদও এসম্পর্কে নীরব নয়: "জাত মারলে তিন সেন;—কেশব সেন, ইষ্টিসেন, উইল্‌সেন।" **গরাণহাটার প্যারী···ছুকরি বিন্দি**—উত্তর কলকাতার সোণাগাছির সংলগ্ন অঞ্চল গরাণহাটা। এখানেও কিছু কিছু ভ্রষ্টা নারীদের আবাস ছিল। প্যারী এবং তার কন্যা অথবা কন্যাপ্রতিম বিন্দি—এমনই দুটি কল্পিত নাম। কালীনাথ সেখানে একদিন স্ফূর্তি করতে গিয়েছিল বলে জানিয়েছে। **বৃন্দাবন**—মথুরার নিকটে ব্রজের অন্তর্গত বন বিশেষ। বর্তমানে নগর ও তীর্থস্থান। রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি ছিল বলে বৈষ্ণবেরা এটিকে পরম পবিত্র তীর্থভূমির মর্যাদা দিয়ে থাকেন। **ওল্‌ড ফুল**—Old fool; বুড়ো আহাম্মক। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম—এই তিন যোগ সম্পর্কে যে-সব উপদেশ দান করেছিলেন, তা এই গ্রন্থে বিধৃত আছে। হিন্দু মাত্রেরই কাছে এটি একখানি পরম ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। **গীতগোবিন্দ**—মহাকবি জয়দেব বিরচিত রাধা-কৃষ্ণের

প্রণয়লীলা বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। তাঁর কাব্যখানির ভাষা সংস্কৃত হলেও, তা বাঙ্‌লাভাষার অনেকখানি নৈকট্য লাভ করেছে এবং অনেক কবি তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে "শ্রীগীতগোবিন্দ ব্রজরসের সুধাসিন্ধু। ইহাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজরসোপাসনার ভজন-সন্ধান প্রাপ্ত হন। …নীলাচলে হেমাচল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলায় গীতগোবিন্দ নিরন্তর আস্বাদিত হইত। ইহাতে দ্বাদশ সর্গ আছে।" (দ্রঃ—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, শ্রীহরিদাস দাস সংকলিত, পৃঃ ১৪৮৭)। জয়দেবের পরিচয়—খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বীরভূমের কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্ম। পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। লক্ষ্মণসেনের ইনি সভাকবি ছিলেন। 'কান্তকোমলপদ' রচনা করার জন্যই তাঁর কবি-প্রসিদ্ধি। **বিন্দা দুতীর গীত**—স্মৃতি-বিভ্রাটবশত কালীনাথের অর্থহীন উক্তি। বৃন্দা (>বিন্দা) শ্রীরাধার প্রাধানা সখী। দূতী—প্রেম-মিলন সংক্রান্ত সংবাদবাহিকা। তার গান। নিরর্থক উক্তি। **মেমরি**—Memory। স্মরণশক্তি। **শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন**—শ্রীবৃন্দাবন নামক তীর্থস্থানে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরম বৈষ্ণবেরা এই রীতিতেই মৃত্যুসংবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে থাকেন। **ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন**—ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক নানাবিধ তর্কবিতর্কের উত্থাপন ক'রে, আলোচনা ক'রে, তাকে বোঝবার চেষ্টা করা। **বোপদেব**—ইনি একজন প্রখ্যাত বৈয়াকরণ। অনেকে মনে করেন যে ইনি ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন—এঁর নিশ্চিত জীবনকাহিনী কিছু জানা যায় না। তবে এঁর সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বাল্যকালে ইনি নাকি জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। অতঃপর বেশি বয়সে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ ক'রে নিজ অধ্যবসায়ের শক্তিতে অল্পকালের মধ্যেই ইনি যথেষ্ট বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ক্রমশ ইনি 'বোপদেবশতক', 'সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ', 'কাব্যকামধেনু', 'হরিলীলা' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এঁর রচিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণই এঁকে অমর করে রেখেছে। **বেমো-টেমো**—ব্যামো-ট্যামো। অসুখ-বিসুখ। **মীট্**—Meet। সাক্ষাৎ। এখানে সভায় উপস্থিত হওয়া।

প্রথমাঙ্ক। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট—কলকাতার বড় বাজার অঞ্চলের একটি রাস্তা। ২৫, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট থেকে উদ্ভূত এবং কালাকার স্ট্রীট ডাকঘরের

এলাকাভুক্ত। **দেক্‌তো লা**—দেখ্‌তো রে। অনুজ্ঞা। লা—মেয়েলি সম্বোধন-বাচক শব্দ। **পাষণ্ড**—বিধর্মী বা নাস্তিক। **পোড়ারমুখো**—নির্লজ্জ, বেহায়া। গালি বিশেষ। **আক্কেল**—<অকল্‌ (আরবি)। কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধি। **পোড়া কপাল**—দুর্ভাগ্য। **হতোভাগা**—<হতভাগ্য। মন্দভাগ্য। গালি বিশেষ। **কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায়**—তুলনীয় বাঙ্‌লা প্রবাদ: "কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা।" অর্থ: চরম অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া। "পাগার পরিবর্তে কুলার বাতাস দেওয়া অত্যন্ত অপমানকর। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কুলার বাতাস দিয়া তাড়াইবার প্রথা ছিল। দীপান্বিতা অমাবস্যার লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মীকে কুলা বাজাইয়া এবং কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিবার পর লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়।" (দ্রঃ—'প্রবাদ-রত্নাকর', সেন, পৃঃ ২১০)। কুলোর সাহায্যে শস্যমিশ্রিত অবাঞ্ছিত বস্তুকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথাগত সংস্কারটি সম্ভবত সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে উঠেছে। **মুড়ো খেঙরা দে বিষ ঝাড়বো**—বাঙ্‌লা প্রবাদ বিশেষ। অর্থ: কঠোর দণ্ড দিয়ে চরিত্র সংশোধন করা। সাপের ওঝারা যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত ছোট ঝাঁটার সাহায্যে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে রোগীর বিষ নামিয়ে তাকে সুস্থ করে—সেই রকম। মুণ্ডিত>মুড়ো। দে=দিয়ে। 'গুরো' সম্পর্কে থাকির বিষোদ্গার কথাগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। **আমি তেমন বান্দা নই**—আমি তেমন পাত্র (এখানে পাত্রী) নই। বান্দা—কথ্য বুলিতে লোক, Chap। বাঙ্‌লা বান্দারা। **নাকের জলে, চক্ষের জলে**—অধিকমাত্রায় কাঁদলে নাক দিয়েও যে জল গড়ায়, তা চোখের ধারার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়। এর অর্থ: চরম দুর্গতি। থাকি সগর্বে জানাচ্ছে যারা যারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, এই বয়সেই সে তাদের অনেকেরই শোচনীয় হাল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। **মদনমোহন**—শ্রীকৃষ্ণ। বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনকেই এখানে সম্ভবত বোঝান হয়েছে। **এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো**—'ও' এখানে 'গুরো' নামক ব্যক্তি—যে থাকির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ হয় না। কাজেই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে তার মরণকামনাও করা হয়েছে বা তাকে গালি দেওয়া হয়েছে। **ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর**—মোল্লা=মুসলমান এবং বৈরাগী কেউই কাছা দেয় না। সেই সাধারণ লক্ষণটি দেখে বামা প্রথমে বাবাজীকে মুসলমান মনে করেছিল! থাকি লক্ষ্য ক'রে দেখল লোকটা আসলে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার রসজ্ঞ উপাসক। কাজেই 'রসের বৈরিগী'

ঠাকুর'। **কুঁড়োজালি**—বৈষ্ণবের মালা-জপের থলি। **মিন্‌ষের**—<মনুষ্যের। অবজ্ঞায় বা তুচ্ছার্থে। **তুলসীবনের বাঘ**—"তুলসীগাছ বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। হৃষ্টপুষ্ট বৈষ্ণব বৈরাগী দ্বাদশ অঙ্গে চন্দনাদির তিলক, ছাপা ইত্যাদি ধারণ করিলে বাঘের মত দেখায়।" (দ্রঃ—'প্রবাদ-রত্নাকর', সেন, পৃঃ ৪৬)। নিরীহ বৈষ্ণবরূপে পরিচয় দিলেও, যার আচার-আচরণ অনুরূপ নয়, তার সম্পর্কেই বাঙ্‌লা বাগ্ধারার অন্তর্ভুক্ত এই কথাটি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। **বষ্টুমী**—<বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবের স্ত্রী কিংবা তার সাধনসঙ্গিনী। **ভেক নিতে পারবি**—থাকি বামাকে কৌতুকসহকারে প্রশ্ন করছে, সে ঐ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী সেজে তার সঙ্গে ঘর করতে রাজী আছে কিনা? ভেক—ছদ্মবেশ ধারণ। **পাঁচ সিকে পেলেই পারি**—পাঁচ সিকে মূল্যের বিনিময়ে ভেক ধারণের ঐরকম রীতি বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাই, বামা তাকে সকৌতুক-সম্মতি জানাচ্ছে। **বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই**—হরিবোল দিয়ে সৎকারার্থে মৃতদেহ নিয়ে যাবার রীতি আছে। বাবাজীর তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। সুতরাং নারীদের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকানো আর তার সাজে না। এই সত্যটি তাকে বুঝিয়ে দিতেই থাকি এই প্রস্তাব করেছে। হরিনাম আবার বৈষ্ণবেরও প্রিয়—তাই ব্যঙ্গ নিপুণভাবে জমে উঠেছে। **ঘাট্ হয়েছে**—ভুল বা অপরাধ হয়েছে। **ঘোর দায়ে পড়্‌লেম**—রীতিমত সংকটে পড়লাম। **মুস্কিলআসান**—মুশকিল (আরবি)+আসান (ফারসি)। সংকটের অবসান। এখানে সংকট-ত্রাতা। একশ্রেণীর মুসলমান ফকির সন্ধ্যায় আলো-হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে "মুশকিল আসান করে দয়াল সত্যপীর" গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বাবাজী এক্ষেত্রে পুলিস সার্জেন্টকে তাই ভেবে ভুল করেছে। **সারজন**—Police Surgent। **রোঁদ**—<Round। নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরে পাহারা দেওয়া। **হাল্লো! চওকীডার!… গিয়া নেই?**—'Hallo' অর্থাৎ 'এই', চৌকিদার! একজন লোক ওদিকে দৌড়ে গেছে না? **ছাব**—সাহিব (আরবি)>সাহেব>সাব>ছাব। **কুচ**—কুছ্ (হিন্দি)। কিছু। **আলবট্**—<অল্‌বত্তহ্ (আরবি)। নিশ্চয়ই। **উষ্টরফ**—উস্ তরফ। ওদিকে। **ড্যাম ইওর…ইউ ফুল**—Damn your eyes—ইধার, you fool। চোখের মাথা খেয়ে মর্ বেটা—এদিকে, তুই নির্বোধ। **আ! ইফ… ক্যেচ হিম**—Ah! If I can catch him—। আ! যদি আমি তাকে পাকড়াতে পারি—। **ওয়াস্তে**—জন্যে। আরবি শব্দ। **আ ইউ**—Ah,

you ! ও, তুমি ! **হোং ইওর**—Hang your ! চুলোয় যাক্ তোর । **ইউ ব্লাডী নিগর্**—You Bloody Nigger । তুই বেজম্মা কেলে ভূত । **ডেকলাও**—দেখাও । **ব্যেগমে**—Bagমে । ঝুলিতে । **হাম বড়া হিন্দু হুয়া—যাচে, কিস্ ওে !**—আমি বড় হিন্দু হয়েছি—রাখে কৃষ্ণ । উচ্চারণ-বিকৃতি লক্ষণীয় । **দোহাই কোম্পানির**—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দিব্য । 'কোম্পানির কাল' সংক্রান্ত আলোচনা "যুগ-পরিচয়" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১) । **হোল্ড ইউর…ব্ল্যাক্‌ব্রূট**—Hold your tongue, you Black-brute । কেলেকিষ্টি জানোয়ারটা, তুই কথা থামা । **দেট্‌স্ রাইট্ !…ডেভল্**—That's right ! You sooty Devil । বটে, বটে ! তুই ঝুলকালিমাখা শয়তান ! **কেস্কা চোরি কিয়া ?**—কার চুরি করেছিস ? **ওস্কো ঠানেমে লে চলো**—ওকে থানায় নিয়ে চল । **সো নেই হোগা**—সে হবে না । **চল্ বে**—'বে' তুচ্ছার্থক অশিষ্ট সম্বোধন (হিন্দি) । **তোম্ নেই মাংটা !**—তোম নেই মাংতা । তুমি চাও না ! **জেবে**—পকেটে । ফারসি শব্দ । **ওয়েল্ দেন্,…ছোড় দেও**—Well then = তবে । তবে আমি দেখছি ওর কোন দোষ নেই, ওকে ছেড়ে দাও । **খাবিন্দ্**—মাননীয় মহাশয় । সম্ভ্রমাত্মক সম্বোধন । **মম্ !…মাই বয় !**—Mum ! Is the word my boy ! চুপ্ ! এই কথাই রইল ! **হাতপাতা রোগ**—ঘুষ খাবার প্রবণতা । **কত চিজ্ পেটিয়েচে**—কত জিনিস পাঠিয়েছে । **গর্দানটা**—<গর্দন (ফারসি) । ঘাড়টা । **হেঁদু**—হিন্দু (ব্যঙ্গার্থে) । **দুনিয়াদারির মজা করে নেলে**—পার্থিব সুখটুকু ভোগ ক'রে নিল । **বেকুফ্**—<'বে' অর্থাৎ না (ফারসি)+'বাকিফ্' অর্থাৎ বোধ (আরবি) । নির্বোধ । **হারামখোর**—শুয়োরখেকো বা নিষিদ্ধ মাংসখোর । **গরুখেগো বেটারগো…ওট্‌তেচে**—গরুখেকো বেটাদের কৃপাতেই আমাদের জবাইখানার এত শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে । **সাম**—সন্ধ্যা । **মাফিক**—মতো । **পিয়ে যায়**—(মদ) পান ক'রে যায় । **মাড়ুয়াবাদি**—<মাড়বার>মাড়ুয়া (মরুদেশ)+আবাদী (বাসকারী) । প্রচলিত অর্থে : পশ্চিমা বা হিন্দুস্থানী ।

[পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্ধিত অংশের শব্দার্থ ও টীকা] ।

কস্‌বী—<কস্‌ব্ (আরবি)=পেশা । বারাঙ্গনা । **বয়ে গেচে**—উৎসন্নে গেছে । অধঃপতিত হয়ে গেছে । **লক্ষ্মীছাড়া বই**—বাজে বই । কালীনাথের দৃষ্টিতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'গীতগোবিন্দ'—পড়বার অযোগ্য বাজে বই । সে

ভিন্ন পথের পথিক। তাই তার কাছে ঐসব ধর্মীয়গ্রন্থের মূল্য কানা কড়িও নয়। **ফাউল কাট্‌লেট্‌**—Fowl-cutlet। মুরগির মাংসখণ্ড ডিম বিস্কুটের গুঁড়ো ইত্যাদি সহযোগে ভাজা। **মটন চপ্‌**—Mutton-chop। ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি বড়া বিশেষ। **নববাবুদের সভাভবনটি**—'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'। এই সভার নাম সম্পূর্ণভাবে মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিত নাও হতে পারে। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত "জ্ঞানার্জন-সভা"র আংশিক ছায়াপাত এর পিছনে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'যুগ-পরিচয়' অধ্যায়ের ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ড. সুকুমার সেনের সন্দেহ অবশ্য কিছুটা ভিন্ন। তাঁর মতে: "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার কথায় স্বভাবতই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম মনে আসে।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২)। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' যে সম্পূর্ণই কাল্পনিক ছিল না, সে বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও একমত। তবে তিনি বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ না ক'রে মন্তব্য করেছেন, "সমসাময়িক কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুসূদন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।" ('নাট্যকার শ্রীমধুসূদন,' পৃঃ ৩১১)। **হরিবাসর**—বৈষ্ণবদের পরিভাষায় একাদশী তিথিযুক্ত দিন। এই দিনে উপবাস দেওয়াই নিয়ম। এখানে ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। **অন্তত্তরে**—<অন্যত্র+এ। অন্য জায়গায়। **ধাঁ করে ধরে এনে**—চট্‌ ক'রে ধরে নিয়ে এসে। 'ধ' এবং 'র'-এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়। কালীনাথ এইরকম অলংকৃত বাক্য প্রয়োগে বিশেষ পটু। তার এই বিশেষ গুণের পরিচয় আমরা এর আগেও অনেকবার পেয়েছি।

জী, মহারাজ—সম্ভ্রমবাচক শব্দ। **কাউয়ার্ড**—Coward। ভীরু, কাপুরুষ। **মরাল করেজ**—Moral courage। নিন্দা ও উপহাসের মুখোমুখি হবার সৎসাহস। **ও কর্ম**—ঘুষ (ইঙ্গিতার্থে)। **মুখ বন্ধ কত্তে পারি**—যা দেখল, তা কারোকে বলবে না—এই মর্মে স্বীকার করাতে পারি। **ননসেন্স**—নিরর্থক শব্দ। **কিক্‌**—Kick। লাথি। **বৈকুণ্ঠে পাঠাও**—স্বর্গে পাঠাও অর্থাৎ মেরে ফেল। কৌতুক ক'রে বলা হয়েছে। **ড্যাম্‌ দি ব্রুট**—Damn the brute। মরুক জানোয়ারটা। **মিসন্‌**—Mission। ঈশ্বরনিযুক্ত কর্ম।

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

লীড্‌—প্রাধান্য বা নেতৃত্ব। **বিটুইন আওয়ারসেল্‌ভস**—Between

ourselves। আমাদের তুলনায়। **সিওলি মর**—ইংরেজ ব্যাকরণবিদ্। **প্রাইড্**—Pride। দর্প বা গর্ব। **এক কাঠি সরেস**—সরস>সরেস। এক মাত্রা বেশি ভাল (ব্যাঙ্গার্থে)। বাঙ্‌লা বাগ্ধারা। **ফ্রেণ্ড**—Friend। বন্ধু। **টুরূথ**—Truth। সত্য। **মেম্বর**—Member। সভ্য বা সদস্য। **ওএট্**—Wait। অপেক্ষা। **কোরম্**—Quorum। সভা আরম্ভ করবার জন্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি। **হিয়র্, হিয়র্**—Hear, Hear। বেশ, বেশ। শ্রোতৃবর্গের সমর্থনসূচক ধ্বনি। **মোসন সেকেণ্ড**—Motion second। উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন। **অবজেক্‌সন**—Objection। আপত্তি। **নেম্. কন.**—nem. con.। ল্যাটিন '*nemine contradicente*' কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। সর্বসম্মতিক্রমে। এখানে অর্থ: সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত! **ব্রাভো**—Bravo। শাবাশ্। **চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্**—Chairman propose। সভাপতির নাম প্রস্তাব। **জেন্টেলমেন্**—Gentlemen। ভদ্রমহোদয়গণ (সম্বোধনে)। **নাউ টু বিজ্‌নেস্**—Now to business। এস, এখন কাজ শুরু করা যাক্। **সরাব**—মদ (আরবি)। **চেয়ারমেনের হেল্‌থ দিতে চাই**—সভাপতির সুস্বাস্থ্যকামনা ক'রে মদপান করতে চাই। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যরীতি। **হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে**—Hip, hip, hurray, hurray। আনন্দসূচক বা অনুমোদনসূচক ধ্বনি! **আড়খেম্‌টা**—গানের তালবিশেষ। **নাগর্**—শৌখিন রসিক প্রণয়ী। **বিধি বাম্ হয়েছে**—অদৃষ্ট মন্দ হয়েছে। বাঙ্‌লা বাগ্ধারা। **কোন্ নতুনে মন মজেছে**—কোন্ নতুন প্রণয়িণীর প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। **কিয়াবাৎ,…রও বাবা**—উৎসাহজ্ঞাপক ধ্বনি। **"গর্ ইয়ার নহো সাকী"**—অর্থ: 'হে সাকী! তুমি যদি আমার বন্ধু না হও।' সাকী=মদ্য-পরিবেষণকারী তরুণ বা তরুণী। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপে অধিকতর পরিচিত হলেও, মূল ফার্সিভাষায় এটি পুংলিঙ্গবাচক। **এক্‌সকিউজ**—Excuse। ক্ষমা বা মাফ্। **ভাট্‌স এ লাই**—That's a lie! এ মিথ্যা কথা! **লায়র**—Liar। মিথ্যাবাদী। **শুট**—Shoot। গুলি করা! আক্ষরিক অর্থে এটি প্রযুক্ত হয়নি, রাগের তীব্রতা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। **ট্রাইফ্লীং**—Trifling। তুচ্ছ বা সামান্য। **মেন্সন**—Mention। উল্লেখ। **ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি**—শান্ত ও স্বাভাবিক দেখলে খুশি হই। **গরম হবো**—(মদ খেয়ে) উত্তেজিত হবো। **হিপক্রীট**—Hypocrite। ভণ্ডতপস্বী। **ইস্‌পীচ**—Speech। বক্তৃতা বা ভাষণ। **এণ্ড উই…ফেলোজ্**—And we are

jolly good fellows। এবং আমরা হাসিখুশিতে ভরা উত্তম সঙ্গী। সুপরষ্টিসন—Superstition। কুসংস্কার। ফ্রী—Free। মুক্ত বা স্বাধীন। পুত্তলিকা দেখে…করি নে—প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসী নই। জ্ঞানের বাতির… দূর হয়েছে—জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা কুসংস্কার জয় করেছি। মাথা মন এক করে—যুক্তিবোধ ও আবেগ-উপলব্ধিকে সমন্বিত ক'রে। সোসীয়াল রিফরমেশন—Social reformation। সমাজ-সংস্কার! এজুকেট—Educate। শিক্ষাদান। টক্কর দিতে পারবে—পাল্লা দিতে বা প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। লিবরটি হল্—Liberty Hall। যে ভবনে সদস্যদের সবকিছু করবার অবাধ স্বাধীনতা থাকে। ইন্ দি নেম্…আওরসেল্‌ভস্—In the name of freedom, let us enjoy ourselves। এস, স্বাধীনতার নামে আমরা যথেচ্ছ সুখভোগ করি। বি ফ্রী—Be free! স্বাধীন হও! কম্, ওপেন্…বিউটিস্—Come, open the Ball, my beauties। সুন্দরীরা এস, বল-নাচ শুরু কর। দেশী খেমটা-নাচকে বল-নাচ বলায় নবর পাশ্চাত্যানুকরণ-অন্ধতার পরিচয় এখানে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। ফর এভর্—For ever। চিরজীবী হ'ক। সপর টেবিল—Supper-table। সান্ধ্য বা নৈশভোজের টেবিল। আমার আরম্ নেও—'to take my arm'—এই ইংরেজি বাক্যরীতির প্রত্যক্ষ অনুকরণ। 'আমার হাত ধর' (অনুজ্ঞা)। পয়োধরীর প্রতি নবর উক্তি। আমাকে ফেভর…হাত—'Please, favour me. Oh, how soft your hand!'—এই ইংরেজি বাক্যরীতির প্রত্যক্ষ অনুকরণ। 'আমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ কর। আহা! কী নরম হাত তোমার!' (অনুজ্ঞা)। নিতম্বিনীর প্রতি কালীনাথের উক্তি। ছিলিম—< চিলম (হিন্দি)। এক কল্কে ভর্তি। সানে না—সাড় আসে না বা নেশাবোধ হয় না। সংজ্ঞা>সান।

দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার প্রসন্নময়ী এবং হরকামিনী একজোটে এবং তাদের প্রতিপক্ষরূপে নৃত্যকালী ও কমলা ভিন্নজোটে তাসখেলায় রত আছে। চিড়িতন, হরতন প্রভৃতি তাসের নামগুলো পর্তুগীজ কিংবা ডাচ্‌দের ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় এসেছে]। দহলা—দশ ফোঁটাযুক্ত তাস। রঙ—খেলায়

প্রাধান্যযুক্ত তাস। ত্রুপ—<Trump। রঙের তাস দিয়ে পিঠ জিতে নেওয়া। টেক্কা—এক ফোঁটাযুক্ত তাস। জান—ঐন্দ্রজালিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। বিছানা পাতছি—বিছানা পাতছি। √পাড়্+আ=পাড়া। ঠাকরুণ—শাশুড়ী বা মা! তুলনীয়—ঠাকুর=শ্বশুর বা পিতা। ঐ যে রামমোহন…সভা আছে—? —১৭৭২ (মতান্তরে '৭৪ খ্রীস্টাব্দে হুগলীজেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। পিতা—রামকান্ত রায়। প্রকৃত পদবী 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। আরবি-ফারসি, সংস্কৃত এবং ক্রমে ইংরেজি ভাষায় ইনি ব্যুৎপন্ন হন। জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করবার জন্যে ইনি বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ধর্ম ও সমাজবিষয়ক না সংস্কার-মূলক আন্দোলনে রত হন। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন, নারীশিক্ষার বিস্তার, সহমরণপ্রথা রদ, সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা, বিচারে জুরি-প্রথার প্রচলন, বাঙ্‌লা গদ্যকে যুক্তিতর্কের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান স্মরণীয়। হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এবং একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাতে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'আত্মীয়সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভাকেই পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮ খ্রীঃ) নাম ও রূপ দেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে ইংলণ্ডের রাজার নিকট প্রেরিত হন এবং ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে 'ব্রিস্টল' নগরীতে সমাহিত করা হয়।

এখানে 'দাদা আজ কোথায় গেছেন ?'—প্রসন্নের এই প্রশ্নের উত্তরে গিন্নিমা সংলাপবদ্ধ কথাগুলি জানিয়েছেন। 'সভা' বলতে ব্রাহ্মসমাজের সভাকেই এখানে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে জানিয়েছেন: ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে এর পুনরুত্থান হয়। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীঃ থেকে ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত এর গৌরবোজ্জ্বল কাল। লক্ষণীয় এই, সেই গৌরবোজ্জ্বল কালের অব্যবহিত পূর্বেই প্রহসনখানি রচিত হয়েছে।

ঠাকুরঝি—ননদ। যাও মেনে—মেয়েলী কথার মাত্রা। মেনে=মনে হয়। এখানে 'মেনে' সম্পূর্ণই নিরর্থক। বেহায়া—নির্লজ্জ। বে (ফারসি), অর্থ: নাই+হায়া (<হয়া, আরবি), অর্থ: লজ্জা। তুই ভাই, তোর দাদাকে নে—তুই তোর দাদার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর কর। ড্যাম—Damn।

মর্‌। **তক্কা**—তওয়াকু (আরবি)>তোয়াক্কা>তক্কা। অর্থ: ভয় বা আপেক্ষা। **তামাসা**—তমাশা (আরবি)>তামাশা। অর্থ: কৌতুক বা মজা। **ভক্‌ ভক্‌ কর্‌ক্যে বেরোবে**—আকস্মিকভাবে এবং উগ্রভাবে ক্রমাগত বেরোবে। অনুকার শব্দ। '**মরা মানুষও শুনলে জেগে উঠে**—বাগ্ধারা। মরা মানুষের কোন চেতনা নেই। কিন্তু শব্দের তীব্রতা এত বেশি, যা তাকেও জাগিয়ে তুলতে যেন সমর্থ। **মাই গুড ফেলো**—My good fellow। হে আমার প্রিয় সহচর! **রিফরম্‌**—Reform। সংস্কার। **ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ?** —Won't I enjoy meslf? আমি কি সুখভোগ করবো না? **পয়োধরী যে?**—'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নবকুমার বারাঙ্গনা পয়োধরীর সঙ্গে স্ফূর্তি ক'রে এসেছিল। সেই ঘোর এখনও তার কাটেনি। তাই মদোন্মত্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে সে স্ত্রীকেই 'পয়োধরী' বলে ভুল করছে। **নিকুঞ্জবনে**—প্রণয়ালাপের উপযোগী তরুলতা-বেষ্টিত মনোরম উদ্যানে। **ডেম্‌ড স্লেভ**—Damned slave। অতি অনুগত কেনা গোলাম। **সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে**—বাগ্ধারা। প্রিয়বস্তুর নিতান্ত অবহেলা। **দুধের বাছা**—একান্ত নিরীহ, সরল এবং নাবালক। **দুরাচার**—দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা, কদাচারী। **নরাধম**—অধম ব্যক্তি, পাপী, পশু। **কুলাঙ্গার**—বংশের গৌরব বা সুনামকে যে কলঙ্কিত করে। **সোনার নব**—নির্দোষ নব। **ওকে যখন…মরে**—"আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারা"—বাঙ্‌লা বাগ্ধারা। সদ্যোজাত শিশুর জীবনীশক্তি এত কম থাকে যে, তার মুখে সামান্য নুন ঠেকিয়ে দিলেই তাকে হত্যা করা যায় বলে লোকবিশ্বাস। কোন ব্যক্তির বিরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হলে তার আত্মীয়স্বজনই সাধারণত এরকম উক্তি করে থাকে। আলোচ্য অংশটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য স্মর্তব্য: "গিরিশচন্দ্র উদ্‌ধৃত অংশটুকু পড়িয়া বিস্ময়ে নাকি বলিয়াছিলেন—'মধু কী খাইয়া ইহা লিখিয়াছিল?' মধু যে কী খাইয়া লিখিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নববাবু কী খাইয়া ইহা বলিয়াছিল, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। কিন্তু ইহার irony অত্যন্ত নিদারুণ। ইহা উইট-এর স্তর হইতে হিউমার-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে।" (দ্রঃ—'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', পৃঃ ৩৭)। **লক্ষ্মীছাড়া**—হতভাগা। নিজের প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে যার হুঁশ নেই। **কল্‌কাতা…রাজধানী**—১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জোব চার্ণক 'সুতানুটি', 'গোবিন্দপুর' এবং 'ডিহি কলকাতা'—এই তিনখানি গ্রাম নিয়ে কল্‌কাতা শহরের পত্তন করেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর

ইংরেজরা 'মুর্শিদাবাদ' থেকে সরিয়ে এনে এখানেই তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ে নানাভাবে সহায়তা ক'রে একশ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা জমে উঠতে থাকে। জীবনবোধের পুরোনো আদর্শ তখন ভেঙে পড়ছে, অথচ নতুন কোন আদর্শ গড়ে ওঠেনি। এই অবসরে ঐ শ্রেণীর লোকেরা কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে এবং বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এইসূত্রে সুরা, সাকী প্রভৃতি সহযোগে শহরের নৈতিক মান ক্রমশই নিম্নমুখী হতে থাকে। কর্তা পুরোনো ধারার মানুষ। তিনি জানেন কলিকালেই এইরকমের বিপর্যয়ের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। কাজেই কলকাতাকে 'কলির রাজধানী' বলে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। **আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন** – I second the resolution। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা "'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন' : অসংগতির দ্বন্দ্ব" – অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। **এখানে একটু থেকে আয়** – প্রসন্ন এবং কমলার প্রতি গিন্নিমার এই নির্দেশ, তার আশঙ্কাতুর পুত্রস্নেহান্ধতাকেই প্রকাশ করে। নাহলে, ঘুমন্ত নবর কাছে আরও কিছুক্ষণ তাদের থেকে আসার তিনি নির্দেশ দেবেন কেন? **বাম হলে কেন?** – বিরূপ হলে কেন? বিধাতার প্রতি হরকামিনীর আক্ষেপোক্তি। **তা বই আর কি** – প্রসন্নর প্রতি হরকামিনীর সমর্থনসূচক উক্তি। বই = ছাড়া। **গলায় দড়ি দে মরি** – হরকামিনীর এই উক্তিতে তার মনোবেদনার তীব্রতা এবং অসহায়তা প্রকাশ পাচ্ছে। **পোড়া কপাল** – মন্দ ভাগ্য। **মাস** – < মাংস। **ঢলাঢলি** – ভারসাম্য হারিয়ে, অথবা সেই ভঙ্গীতে, পরস্পরের গায়ে এলিয়ে পড়া। কেলেঙ্কারী।

———

(খ) প্রহসনটি সম্পর্কে কিছু বিশিষ্ট অভিমত

১. "তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।"

['সাবিত্রী' (১২৯৩), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৯]।

২. "'ইয়ং বেঙ্গাল' অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদেঘাষণই বর্ত্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।"

['বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (পত্রিকা), রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৫ম পর্ব, ৫০ খণ্ড, পৃঃ ২৮১]।

৩. "আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।"

['বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩), রামগতি ন্যায়রত্ন, পৃঃ ২৬৭]।

৪. "'একেই কি বলে সভ্যতা'-র বিষয় নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার···মধুসূদন প্রকারান্তরে নিজের দলকেই তিরস্কার করিয়াছেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যদের আদর্শ নিজ বন্ধু-সহপাঠীদের মধ্য হইতেই তিনি লইয়াছিলেন।···বাঙ্গালা প্রহসনের আদর্শ ধরিয়া মধুসূদনের বই দুইটিকে নিখুঁত বলা চলে। সরসতা সূক্ষ্ম এবং উঁচুদরের না হইলেও বাস্তব মানবিকতার জন্য কার্য্যকর ও সফল হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রায় সকল প্রহসন এবং কোন কোন নাটক মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই প্রহসন দুইটিতে মধুসূদন আগাগোড়া দেশি সামগ্রী লইয়া কারবার করিয়াছেন।"

['বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), ড. সুকুমার সেন, পৃঃ ৫২-৫৪]।

৫. "তাঁহার প্রহসন দুইটিতে স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে তাঁহার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ত লক্ষ্য তাঁহার নিখুঁত সঙ্গতিবোধ ও নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখিনতাকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। সমাজজীবনের অসংখ্য দুর্নীতি-অসঙ্গতির মধ্যে আপন শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জনে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত না করিয়া তিনি সুনির্বাচিত একটি বিষয় হইতেই পূর্ণ কৌতুকরসের বিকাশ সাধন করিয়াছেন।"

['বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (২য় খণ্ড), ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪]।

৬. "মাইকেলের বাংলা গদ্যের কলম জড়তাগ্রস্ত ছিল। তাঁহার একখানি বাংলা পত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহার ভাষা যেমন জড়, তাহার শোকপ্রকাশের ভাবও তেমনই কৃত্রিম। 'কৃষ্ণকুমারী'র গদ্য নিতান্ত কৃত্রিম; 'হেক্টর বধে'র ভাষা কিম্ভূত। অথচ প্রহসন দু-খানির ভাষা স্বচ্ছ, অনায়াস; সংলাপ নাটকীয়, হাস্য-ও শ্লেষ-সমুজ্জ্বল; আর নরনারীগণ সকলেই বাস্তব জীবনের সহচর—না তাহারা পৌরাণিক, না ঐতিহাসিক, না ছায়াপ্রায়। তাহারা এমনই সজীব যে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে রক্ত ক্ষরিত হইবার আশঙ্কা। বাস্তবিক তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রহসন দুটির এমন শ্রেণীগত পার্থক্য যে বিস্মিত হইবার কথা বটে।"

['বাংলা সাহিত্যের নরনারী', প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ৩৪]।

৭. "'একেই কি বলে সভ্যতা'কে উচ্চশ্রেণীর প্রহসন বলিয়া অভিনন্দিত করা যায় না। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে মদ্যপান করিত ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ঘরে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কথা সোজাসুজি বলার মধ্যে কোন সাহিত্যিক কৌশলের পরিচয় নাই।...ইহার কাহিনীতে বা চরিত্রসৃষ্টিতে কোন অভিনবত্ব নাই।"

['মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার', ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪৯-১৫০]।

৮. "'একেই কি বলে সভ্যতা'র একটি প্রধান গুণ এই যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইয়াও ইহার মধ্যে মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে নাই—কাহিনীটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য নিতান্ত অপরিসর রচনা বলিয়া চরিত্রগুলি সম্যক্ বিকাশলাভ করিতে না পারায় ইহার রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। তথাপি নূতন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা সর্বপ্রথম প্রহসন রচনা বলিয়া ইহার স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।...মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র

যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র গার্হস্থ্য কিংবা পারিবারিক জীবনাশ্রিত কোন রচনা তাহা বলিতে পারা যাইবে না। বাংলার একটি সমসাময়িক বৃহত্তর সমস্যা ইহার অবলম্বন হইয়াছিল।"

['নাট্যকার শ্রীমধুসূদন', ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১৫-৩১৬]।

৯. মধুসূদনের ক্ষমতা অসীম বটে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' মাত্র একদিনের ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একদিনের কাহিনীর মধ্যে মাইকেল কোনো বিষয় বর্ণনা করিতে বাকি রাখেন নাই। অথচ তিনি অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় একটা বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। খণ্ডচিত্রগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া এক অখণ্ড রসের সৃষ্টি করিয়াছে। চরিত্রগুলির সংলাপ সম্পূর্ণ বাস্তব ও স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চিত্রাঙ্কন এমন সার্থক হইয়াছে।"

['বাংলা নাটকের ইতিহাস' (৬ষ্ঠ সংস্করণ), ড. অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১০০]।

১০. "'একেই কি বলে সভ্যতা' পুরোপুরি রঙ্গরসের প্রহসন, কাহিনী নাম-মাত্র।·· তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি, তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা কবি এমন কৌতুক ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বহুদিন কেউ তাঁকে এবিষয়ে অতিক্রম করতে পারেননি।···দেখা যাবে মাইকেলের নানা ধরনের বাংলা, যার উপভাষা, কতটা জানা ছিল, আর জনজীবনের সঙ্গে তিনি কতটা নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। দীনবন্ধুর মতো সত্যকারের নাট্য-প্রতিভাশালী ব্যক্তিও মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে 'সধবার একাদশী' লিখেছিলেন।"

['বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫০-৪৫১]।

১১. " 'একেই কি বলে সভ্যতা'র দুর্বলতা আছে, কিন্তু সংলাপ রচনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে এর নিপুণতা অনস্বীকার্য। সমাজসমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন কবি, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত আচরণ ও প্রবণতাকেও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। রচনাটি তাই কোনক্রমেই সামান্য নয়।"

['নাট্যকার মধুসূদন', ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ১৬৭]।

১২. "মধুসূদনের প্রহসনে চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের অসঙ্গতির আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়, তাহাদের চলা-বলা-ও-করার মধ্য দিয়া নিজেরাই স্বাভাবিক ভাবে হাস্যাস্পদ এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে। অন্যের ভাষ্যের অবকাশ রাখে

না।…ইয়ং বেঙ্গলের ইঙ্গ-বংগীয় ভাষাটি অবিকল ভাবে রূপ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অতি সামান্ত কথায় এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে যাহা অন্ত কোনো নাট্যকারের রচনায় ইহার পূর্বে পাওয়া যায় নাই। প্রহসন দুইখানির আর এক বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ত সংহতির মধ্যেও পর্যাপ্ত সঙ্গতি। ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিপাদ্য বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত যতটুকু প্রয়োজন তাহা হইতে অবান্তর কি চরিত্র, কি ঘটনা, কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তাই রসও অখণ্ড-ভাবে জমাট বাঁধিয়াছে।"

['বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা', অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, পৃঃ ১৪২]।

১৩. "মধুসূদনের এ নাটকটিতে বাস্তব দৃষ্টিভংগীর চিত্তগ্রাহিতা আছে। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় যে সামাজিক আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তার মধ্যে চর্ম-চক্ষে ধ্বংসাত্মক দিকটি লক্ষণীয় হলেও—তাদের বিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতি সামাজিক গঠনমূলকতারও তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। সমগ্রের কল্যাণের জন্তে বিচার বুদ্ধির মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাধীনতার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে মানব-চিন্তা ও সমাজচিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্যীকরণ চেয়েছেন তাঁরা।…কিন্তু এ নাটকে মধুসূদন নববাবুদের অসংগতি ও বিচ্যুতির দিকটিও সমালোচনা করেছেন। নববাবু মধুসূদনের ব্যক্তি-আত্মার মুখপাত্র হলেও—শ্রেণীস্বভাবই তার মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রকট। আবার কর্তামশায়ের ধর্মভীরু বৈষ্ণব ভাবধারার পরিচয়কে এই পটভূমিকার বিপরীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিত্রিত করে মূল প্রচ্ছদকে আরও ঔজ্জ্বল্য দিয়েছেন।"

['বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য', ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, পৃঃ ২০০-২০১]।